KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 8/1 8/2 8/3 8/4-5 8/6	Year of Publication : শ্রাবণ ১৩২৮ ভাদ্র ১৩২৮ আশ্বিন ১৩২৮ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৮ পৌষ ১৩২৮
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সবুজ পত্র

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদক—শ্রী প্রমথ চৌধুরী।

সহকারী সম্পাদক—শ্রী সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অষ্টমবর্ষ—প্রথম খণ্ড।

সূচীপত্র।

অষ্টম বর্ষ—প্রথম খণ্ড।

——:*:——

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	অভিভাষণ	শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	... ... ১১০
২।	অভিনন্দন	শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত	... ... ১২১
৩।	আমাদের সঙ্গীত	শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	... ... ৭৩
৪।	আমার খুড়ো (গল্প)	শ্রীমনীমাধব চৌধুরী	... ... ৪৬
৫।	আশীর্ব্বচন	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	... ... ১২৪
৬।	উড়ো-চিঠি	হাবিলদার	... ... ৪৭
৭।	উড়ো-চিঠি	অতিথি	... ... ২৮৫
৮।	কবি মধুসূদন (কবিতা)	শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	... ... ১৩৫
৯।	কুঞ্জীর ভবিষ্যত (গল্প)	শ্রীকিরণশঙ্কর রায়	... ... ৫৯
১০।	গেল মাঘ (কবিতা)	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	... ... ৩৭৩
১১।	জার্ম্মানি সম্বন্ধে দুই চারিটী সাধারণ কথা	শ্রীদিলীপ কুমার রায়	... ... ৩৪২
১২।	টিপ্পনী	বীরবল	... ... ১৬৮
১৩।	দেশের শিক্ষা	শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক	... ... ১৬
১৪।	দরিদ্র নারায়ণায় নমঃ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য	... ... ১৩৯
১৫।	দিল-মহলের গল্প (গল্প)	শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	... ... ৩৫৭
১৬।	নারীর পত্র	অনৈক বঙ্গনারী	... ... ১৮৭
১৭।	নির্ব্বাসিতের আত্মকথা	শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	... ... ১২৯

১৮।	নৃত্য-শিক্ষক (গল্প)	শ্রীননীমাধব চৌধুরী … …	৩০০
১৯।	পট (গল্প).	শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর … …	১১৮
২০।	পত্র	বীরবল … …	২১৯
২০।	ফরাসী-কবি "বোদেলের"	শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্ত … …	২২৬
২২।	ফাগুনের সাড়া (কবিতা)	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী … …	৩১৫
২৩।	বিদ্রোহী (কবিতা)	শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক … …	১৩১
২৪।	বিলাত প্রবাসীর পত্র	ভবদীয়— … …	২৬১
২৫।	বেহুঁইন (কবিতা)	শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী … …	২৭৯
২৬।	ভারতের শিক্ষার আদর্শ	শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রীঅমূল্য রতন প্রামাণিক	১১৩, ১২৯, ২০৯
২৭।	যুগল-পত্র	শ্রীদিলীপ কুমার রায় ও শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩২২
২৮।	রবি-প্রশস্তি (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগ্‌চি …	১২৬
২৯।	রুগ্ন কৃষক	শ্রীহৃষীকেশ সেন … …	৩৭
৩০।	লেখকের প্রার্থনা	শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী … …	১৯৫
৩১।	শিক্ষার মিলন	শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর … …	৮০
৩২।	Slave-Mentality বা শূদ্র-আত্মা	শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী … …	১
৩৩।	সম্পাদকের নিবেদন	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী … …	৬৭
৩৪।	হিন্দুজাতির পরিণাম	শ্রীরমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় … …	১৬১

Slave-Mentality বা শূদ্র-আত্মা।

——:*:——

প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্ একটা সুরা বিশেষ—ও উদরস্থ হ'লেই চোখ একটু না একটু বিস্ফারিত হবেই এবং প্রাণে একটু না একটু রঙ্ ধরবেই। কিন্তু ঐ একটুকু নেশা না হলেও আবার মানুষের চলে না। যাঁরা দেশের ও দশের কাজ করতে নেমেছেন, তাঁদের সবাইকে যদি একেবারে বোধিসত্বের মতো গম্ভীর হ'য়ে কর্ত্তব্যের কণ্ঠে 'সংবদধ্বং' 'সংগচ্ছধ্বং' বল্‌তে হয়, এবং সৃষ্টির চারিদিকে কোথাও যেন এতটুকু অকেজো নিঃশ্বাস না পড়ে তাই সন্তর্পনে দেখতে হয়, তবে তাই দেখতেই তাঁদের সময় কেটে যাবে—আর কাজের কিছুই হবে না। কাজে একটু রস চাই বই কি—জীবনে একটু ফুর্ত্তি চাই বই কি! নইলে মানুষ বাঁচে না—ত্রিশ বছরে সে বুড়ো হয়, বত্রিশ বছরে তার চুল পাকে দাঁত পড়ে, আর চল্লিশ বছরে তার জীবনের বোঝা একেবারে আশ্চর্য্য রকম হাল্‌কা হ'য়ে যায়। আসলে জীবনে একটা নেশা চাই-ই, তা সে খেলারই হোক্ বা পড়ারই হোক্, প্রেমেরই হোক্ বা জ্ঞানেরই হোক্, কর্ম্মেরই হোক্ বা ধর্ম্মেরই হোক্। ভৌতিক সুরা যেমন প্রাণের Stimulant—মানস-সুরা তেমনি আত্মার Stimulant বা আত্মিক সুরা মনের Stimulant;—যেদিক থেকেই ধরা যাক্ না কেন, ওর ফল একই। ঐ Stimulant মানুষের জীবনকে সতেজ রাখে ও

মনকে সহজে বুড়ো হ'তে দেয় না। সুতরাং মানুষের পরমায়ুও বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু ঐ প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ যখন পলিটিক্যাল প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ হয়, তখন তা হ'য়ে ওঠে একেবারে ত্বরিতানন্দ। ওর ফলে মনের পাতায় সত্য মিথ্যার মাঝখানের রেখাটা এমনি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায় যে, তখন দেখা যায় প্যাট্রিয়ট্‌ সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে একটা নৃত্য সুরু করেছেন যেটা নটরাজের প্রলয়নৃত্যের মতোই হ'য়ে উঠেছে—অর্থাৎ তাতে ভাঙ্গাটা যেমন এগিয়ে যায়, গড়াটা তেমনি পিছিয়ে পড়ে। কেননা ভাঙ্গাটা চোখ বুঁজেও করা চলে, কিন্তু গড়াটা জ্ঞান না হ'লে চলে না। জ্ঞান অবশ্য সত্য মিথ্যার জ্ঞান। কেননা মিথ্যা মানুষকে মৃত্যুই দান করতে পারে—সত্যই তাকে প্রাণ দেয়, তাকে সৃষ্টি করবার শক্তি দেয়।

(২)

উপরের ঐ ভূমিকার তাৎপর্য্য কি?—বল্‌ছি।

কিছুদিন থেকে দেশের পলিটিক্সের হাওয়ায় একটা কথা উড়্‌ছে, কথাটা হচ্ছে Slave-mentality. ইংরেজের স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছথেকে আমরা নাকি কোন লাভই লাভ করি নি—যা লাভ করেছি সেটা হচ্ছে নিছক ও নির্জ্জলা Slave-mentality. অবশ্য বিদ্যালয় যদি বিদ্যাদানের পরিবর্ত্তে কেবলই Slave-mentality দান করে, তবে তার সংশ্রব যত শীঘ্র ছাড়া যায় ততই মঙ্গল,—বিশেষত আমাদের উদ্দেশ্য যখন হচ্ছে স্বরাজ-লাভ। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনার কায়দাকানুন একেবারে উঁচু দরের না হলেও

সেটা যে বাঙালী জাতির কোন ভালই করে নাই, কেবল তাদের Slave-mentality-ই গড়ে তুলেছে, তা যে অবিসংবাদিতরূপে কোথাও প্রমাণিত হয়েছে, এটা কানেও শুনি নি চোখেও পড়ি নি। তবুও যে অবিসংবাদিতরূপে ওটা সবার কাছে গ্রাহ্য হয়েছে, তার মূলে আছে আমাদের পলিটিক্যাল প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌। এতে একটা জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই যে, আমাদের স্বদেশ-প্রেম আজও স্বরাট্‌ হয় নি। আজও সেটাকে পরের দোষের ঠেকো দিয়ে উঁচু করে' রাখতে হয়। নিজ হাতে অমৃত আহরণ করবার ইচ্ছা আমাদের তখনই জাগে, যখন বুঝি পরে আমাদের বিষ দিচ্ছে। আজও আমাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা নিজের বাঁচবার ইচ্ছার জোরে প্রারব্ধ হয় না, পরের দেওয়া মৃত্যুর ভয়ে হয়। আজকে যে আমরা স্বরাজ চাচ্ছি, সেটা স্বরাজের আনন্দেই নয়—সেটা চাচ্ছি ইংরেজ শাসনে ব্যথিত হ'য়ে। স্বরাজের স্বপ্নের চাইতে জালিয়ানালাবাগের বিভীষিকা আমাদের চোখে বেশী স্পষ্ট। নিজের পায়ে দাঁড়াবার, নিজের হাতে নিজের বিদ্যামন্দির গড়ে' তুলবার সত্য ও সহজ শক্তি আমাদের নেই বলেই, পরের দেওয়া বিদ্যাকে নিন্দা করে' আমরা আমাদের ঐ পথে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করছি। আজ তাই এ-কথা আমরা যত মনে করে' রাখি ততই মঙ্গল যে, মানুষের ঐ অবস্থা, সৃষ্টি করবার সত্য ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামক নয়। কবির কাব্য বা কর্ম্মীর কর্ম্ম এ দুয়ের পিছনে একই সত্য রয়েছে। কবি কাব্য লিখতে বসেন, অ-কবি অ-কাব্য লিখছেন বলে' নয়—কর্ম্মীর কর্ম্ম-প্রচেষ্টাও তখনই জয়যুক্ত হবে, যখন তা হবে স্বরাট ও স্বাধীন। পরমুখাপেক্ষিতা আছে দু'রকমের। এক পরের মুখ চেয়ে আশা করা, আর এক পরের মুখ চেয়ে নিরাশ হওয়া।

শেষেরটী ঐ আগেরটীরই ছোট । আমাদের মুখ থেকে আজ যে কথা ফুট্‌ছে ও আমাদের যে অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ পাচ্ছে, সে হচ্ছে অভিমানে—তার জন্ম হয়েছে পরের মুখ চেয়ে নিরাশ হওয়ায়। মানুষের অন্তরে যতক্ষণ ব্রহ্ম না জেগেছেন, ততক্ষণ সে বাইরের কারণকেই তার সৃষ্টির motor-power রূপে ব্যবহার করতে চায়। তার ফল মানুষের অকৃতার্থতা ও অনুষ্ঠানের অকৃতকার্য্যতা।

(৩)

কিন্তু যাক্ সে কথা। আলোচ্য বিষয়টা হচ্ছে এই যে, ইংরেজের ইউনিভারসিটি আমাদের কেবল Slave-mentality দান করেছে। এই Slave-mentality ইংরেজিতে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার বাঙলা করলে দাঁড়ায়—দাস্য-ভাব নয়, শূদ্র-আত্মা। এখন এই শূদ্র-আত্মা কি ইংরেজের ইউনিভারসিটিতে পড়াশুনোর ফলই ?—কি জানি ! কে জানে ! হয় ত তাই, হয় ত নয়। কিন্তু যে কথাটা ওর সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে সেটা হচ্ছে এই যে, ইংরেজ ইউনিভারসিটি বসিয়ে ভারত-বাসীকে Slave করে নি, ভারতবর্ষকে Slave করে' তারপর ইউনিভারসিটি বসিয়েছে। অবশ্য ইংরেজের ভারতবর্ষ জয় করা সম্বন্ধে দুটো উল্টো মত আছে, হয়ে একটা হচ্ছে যে ; তা, করেছে ইংরেজের তরবারীর জোরে, আর এক হচ্ছে, ভারতবাসীর অন্তরে ইংরেজের প্রতি আত্যন্তিক মহিমায়। কিন্তু ঐ দুই থিওরির যে-কোন-একটার মধ্যে ঐতিহাসিক সব সত্যটুকু নেই। সে সত্য হচ্ছে এই যে, ইংরেজ ভারত জয় করেছে তরবারীর জোরে ঠিকই, কিন্তু সে তরবারী খেলেছিল ভারতবাসী কালা আদমিদেরই সহস্র সহস্র হাতে। তাতেই

দেখা যাচ্ছে যে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার আগেও দেশে শূদ্র-আত্মার অভাব ছিল না। কেননা শূদ্র-আত্মার ধর্ম্মই হচ্ছে পরের হাতে পরের ইচ্ছায় পরের প্রয়োজন জুগিয়ে চলা। ইংরেজের ভারত অধিকার করাটাই প্রমাণ যে ভারতবাসী তাই করেছে, আর এটা সবাই জানেন যে, তখন ভারতে ইংরেজের ইউনিভারসিটির একটা থাম পর্য্যন্তও গড়া হয় নি। আসলে ইংরেজ ভারত অধিকার করবার পূর্ব্বে Slave-mentality বলে' কথাটা দেশে না থাকলেও, ও পদার্থটীর অভাব দেশে একান্তভাবে ছিল না।

(৪)

সুতরাং এখন যে প্রশ্নটী ওঠে সেটি হচ্ছে এই যে, শূদ্র-আত্মার লক্ষণ কি ?—এক কথায় সে লক্ষণ হচ্ছে, আত্মা হ'তে নব নব সৃষ্টি করবার শক্তি ও সাহস নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাওয়া। যখন দেখব যে মানুষের অন্তরে বৃহৎ চিন্তা, বৃহৎ জ্ঞান, বৃহৎ স্বপ্ন, বৃহতের আকর্ষণ অতি অস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে—বৃহৎ জীবনের বৃহৎ আনন্দের অঙ্কুর শুকিয়ে গিয়েছে, সেখানেই বুঝব মানুষ শূদ্র হ'য়ে উঠেছে। যেখানে চলতে ভয় নিঃশ্বাস নিতে ভয়, আনন্দ করতে ভয়, সেখানেই বুঝব শূদ্রের আবির্ভাব হয়েছে। যেখানে জীবনের চাইতে মৃত্যুকে, স্বর্গের চাইতে নরককে, বিশ্বের চাইতে গৃহকোণকে বড় করে' তোলা হয়েছে সেখানেই জানব শূদ্র-আত্মার শঙ্কা আকুল বিশেষ কার্য্য-বিবরণী আপনাকে চরিতার্থ করে' করে' চলেছে। আর বাঙালী হিন্দুর ও অবস্থা ১৮৫৮ সাল থেকে, অর্থাৎ যে সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপিত হয় সেই সাল থেকে জন্মলাভ করে নি, তার আগে হ'তেই ওর পরিচয় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সিরাজদ্দৌলাকে মস্‌নদ থেকে নামাবার পর Press Act, Arms Act-বিহীন তখনকার বাঙলার কোটী কোটী হিন্দুমুসলমানের সামনে ধীরে ধীরে দেশটা যে ইংরেজের হাতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল এটা অবশ্য সমাজের ব্রহ্মণ্যজ্ঞান, ক্ষত্রিয়বীর্য্য, বা বৈশ্য বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। সমাজ-অন্তরে শূদ্র-আত্মা সহজ হ'য়ে উঠেছিল বলে' দেশে মুষ্টিমেয় বিদেশী সেদিন আপনাদের এমন করে' প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করেছিল। দেশ শূদ্র হ'য়ে উঠেছিল, তাই বৈশ্য এমন করে' তাকে করতলগত করতে পেরেছিল।

কিন্তু সে যাহোক্—রাজনীতির দিকটার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্। কেননা হিন্দু বাঙলার স্বাধীনতার কথা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অতীতের কথা হ'য়ে উঠেছিল। সপ্তদশ অশ্বারোহী বাংলা জয় করেছিল, এটা উপকথাই হোক্ আর ইতিহাসই হোক্, এ-কথা সত্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বাংলার রাজনীতি বাঙালীর সমাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করেছিল। কেননা অষ্টাদশ শতাব্দীর বহুআগে হতেই বাংলার রাজনীতি ছিল নবাগত মুসলমানদের হাতে, আর বাংলার সমাজনীতি ছিল বাঙালী হিন্দুদের হাতে।

সুতরাং ইংরেজ এদেশে আসবার সময়টাতে বাঙালী হিন্দুর মন নামক পদার্থটির কেমন চেহারা ছিল, সেটা তখনকার মুসলমানের রাজনীতিতে খুঁজলে পাওয়া যাবে না, খুঁজতে হবে তখনকার বাঙালী হিন্দুর সমাজনীতিতে। হিন্দু বাংলার মনের ছাপ মিলবে একমাত্র হিন্দু বাঙালীর সমাজের পিছনে। রাজনীতি যেখানে মুসলমানের

হাতে, সেখানে সে রাজনীতির পিছনে নিশ্চয়ই হিন্দুর মন মিলবে না। বলা বাহুল্য মনের খোঁজ নেওয়ার অর্থ আত্মারই সংবাদ নেওয়া। কেননা মন আত্মাকেই প্রকাশ করে, আর কিছুকে নয়।

মোটামুটি হিসেবে পলাশীর যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত বাঙালী হিন্দুর মনের ধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই যে, সে মন হ'য়ে গেছে শূদ্রের মন।

তাই দেখতে পাই যে, সে মনে নব নব স্পন্দনের কোন অনুভূতি নেই নব নব সৃষ্টির কোন বেদনা নেই, মানুষের চিরন্তন পথচলার কোন আনন্দ নেই। সাহিত্য বল, আর্ট্ বল, ধর্ম্ম বল, দর্শন বল, বাঙালীর মনে সমস্তই একটা দাঁড়ি টেনে বসে আছে। আর দেখতে পাই শূদ্র আত্মার সবার চাইতে বড় নিদর্শন,—জীবন মনের নিদারুণ ভীতি। নূতন পথে চলা, নূতন কিছু বলা, নূতন কিছু ভাবা,—যাতে ব্রাহ্মণের আনন্দ, ক্ষত্রিয়ের উল্লাস, বৈশ্যের সুখ—তার বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা। বাঙালী মনের প্রচণ্ড দাসত্বের নিদর্শন পাই এযুগে তাদের প্রাণপণে গতানুগতিকের পথে চলার বিশেষ বিবরণে, তাদের জীবনে শাস্ত্রীয় শ্লোকের বিরাট অট্টহাস্যে ও মেয়েলী ছড়ার মৃদু কৌতুক-হাসিতে।

সত্য কথা এই যে, মানুষের বড় দাসত্ব মনের দাসত্ব। বলা বাহুল্য মনুর ও মানবের দাসত্বে বড় বিশেষ প্রভেদ নেই। আমরা সবাই জানি বাঙালী হিন্দুর—এমন কি সমস্ত ভারতের হিন্দুর—এই দাসত্ব কত জমাট বেঁধে উঠেছিল; অতীতের জ্ঞান, অতীতের ধর্ম্ম, অতীতের কর্ম্ম আমাদের চারিদিকে তার মোহ ও ভয় দিয়ে আমাদের অমানুষ করে' তুলেছিল; আর আমরা পদে পদে শিখেছিলেম ওর চাইতে

পরম সুখ ও পরম মঙ্গল আর কিছু নয়, আর কিছুতে নেই। এর চাইতে শূদ্রত্বের আর কি বড় নিদর্শন হ'তে পারে? সারা জগত যখন সাত সাগর ডিঙিয়ে আমাদের দু'য়োরে এসে ঘা দিচ্ছিল, তখন আমরা প্রাণপণে মন্ত্র উচ্চারণ করেছি—হে অতীত! আমাদের সকল বৃহৎ হ'তে রক্ষা কর, সকল নূতন হ'তে দূরে রাখ, সকল সাহসে বঞ্চিত রাখ। হে অতীত! তোমার মাঝে আমার মৃত্যু হোক, তাও আমার প্রেয় কোন নূতন প্রেয়কে অভিনন্দিত করবার দায় থেকে আমাকে রক্ষা করে' করে' চল। এ মন্ত্রে ত ব্রাহ্মণের দৃষ্টি নেই, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য নেই, বৈশ্যের স্বপ্ন নেই—এ যে শূদ্র মনের শূদ্র আত্মার চিরন্তনের মর্ম্মোচ্ছাস। আর ঐ মনোভাব হিন্দুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর জন্মলাভ করে' নি—তার আগেই বর্ত্তমান হ'য়ে ছিল। আজও আমরা জানি, নূতন পথে এক একটী পদক্ষেপ করবার সময় হিন্দুর অন্তর থেকে কি এক ভীতিপূর্ণ গভীর আর্ত্তনাদ ওঠে। ঐ আর্ত্তনাদ একমাত্র শূদ্রেরই স্বধর্ম্ম।

পলিটিক্সে সুবিধা হবে মনে করে' আজ আমরা যত বড় করেই ভাবি না কেন যে, ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের খালি দাসমনোভাবই জাগিয়ে তুলেছে—একথা আমরা মনে মনে জানি যে, ইংরেজি শিক্ষা ইংরেজের সাহিত্য আমাদের ঐ গতানুগতিক মনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে একটা প্রচণ্ড আঘাত করেছে, সে আঘাত মুগুরের আঘাত নয়—সে আঘাত জীবনের আঘাত। সে আঘাতের প্রথম ও প্রধান মঙ্গল হচ্ছে এই যে, আমাদের গতানুগতিক মন একটা প্রচণ্ড দোলা খেয়েছে। এই দোলা খাওয়া আমরা অমঙ্গল মনে করি নে। প্রমাণ, আজ অনেকের মধ্যেই গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ ছেড়ে দেবার কথা

উঠলেও, কারো মুখেই ইংরিজি ভাষা বা সাহিত্য বয়কট করার কথা শোনা যায় না। একথা ত চোখ বুঁজেও সত্য বলে' বোঝা যায় যে, পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের যে স্থান আমাদের মনোজগতে ছিল, আজ আর তা নেই; এবং আজ যে স্থান আছে, পঞ্চাশ বছর পরে আবার সে স্থান থাকবে না। কিন্তু এক মনের নেভা প্রদীপ, আর এক মনের জ্বালা প্রদীপে যে ধরিয়ে নেওয়া যায়, এ সত্য পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শ আমাদের মনকে সারা বিশ্বের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে, সাত সাগরের কলধ্বনিতে আমাদের প্রাণের বৃহত্তর ধর্ম্মের কথা শুনিয়েছে—যে মন সংকীর্ণ ছিল, যে প্রাণ সঙ্কুচিত ছিল, সেই মন প্রাণকে একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গতিশীল করেছে। আমার একথা যে কত সত্যি, তা টোলে-পড়া একটি পণ্ডিত ও কলেজ-ছাড়া একটি ছেলের তুলনা করলেই, তাদের দু'জনের মনের চেহারার পরিচয় নিলেই প্রমাণিত হবে। আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভ করিয়ে দেবার সাহায্য করেছে, একথা বল্‌লে নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ করা হবে না।

টোলে-পড়া পণ্ডিতের কথা শুনে কারও কারও মনে পড়ে' যেতে পারে যে, ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি শিখে আমরা জাত ও জাতীয়তা দু'ইই হারিয়েছি,—কেননা আজ আমরা টিকী ও টীকা, এ দুটোর পূজোই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু যে কথাটা নিশ্চয়ই সত্যি সেটা হচ্ছে এই যে, মনের প্রাণের সংকীর্ণতা, সঙ্কুচিত অবস্থা, কোন জাতিরই জাতীয়তা হতে পারে না,—কেননা তা কোন মানুষেরই পরম ধর্ম্ম নয়। এই

কথাটা মনে রাখা সর্ব্বদা দরকার যে, যে-বিচার যে-অনুষ্ঠান সমাজের পক্ষে এককালে সত্য ও সহজ ও উপযোগী ছিল, সে বিচার সে অনুষ্ঠান আর এককালে সত্য সহজ ও উপযোগী নাও থাকতে পারে। ইংরেজি সাহিত্যের চলবার বেগ এইটুকু বোঝবার মতো সাহস আমাদের মনে চারিয়ে দিয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালীর মনকে একদিকে শাস্ত্রীয় শ্লোক, অন্যদিকে মেয়েলী ছড়া, এই দুই স্তূপের ভিতর থেকে টেনে বের করেছে। এই টেনে বের করবার কাজ আজও শেষ হয় নি।

এইখানে কেউ কেউ বলবেন যে, আমাদের মনকে অতীতের ভগ্ন রাজপ্রাসাদের স্তূপ থেকে টেনে তোলা হোক্, কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কিছুই হয় নি। ও স্তূপ থেকে আমরা উঠেছি কেবল পরের মনের রূপ ধরবার জন্যে। আমরা আগে বেদ আওড়াতেম, আজ না-হয় বাইবেল আওড়াই ;— সুতরাং আমাদের যে শূদ্র-মন সেই শূদ্র-মনই রয়ে গেছে। কথাটা কতকটা সত্য, কিন্তু পুরোপুরি সত্যি নয়। আজ আমাদের জাতীয় মন একটা গতির মাঝদিয়ে চলেছে—সাহিত্য আর্ট বিজ্ঞান পলিটিক্স সর্ব্ব বিষয়েই তাই দেশে একটা মুভ্‌মেণ্ট চলছে। এই সব মূভমেণ্ট যদি পরের অনুসরণে না বলে' পরের অনুকরণেই ধরে' নি, তবুও এই সব মুভমেণ্ট মনের যে গতিশীলতার ফল, সেই গতিলাভই একটা মস্ত লাভ ; কেননা গতি যেখানে আছে, সেখানে মিথ্যা ও অমঙ্গল আজ না হোক্ কাল, কাল না হোক্ পরশু ভেসে যাবেই যাবে। সুতরাং ওটা সমাজের দিক থেকে একটা মস্ত সম্পদ। আশা করি এবিষয়ে দু'মত হবার সম্ভাবনা নেই। কেননা এটা প্রত্যক্ষ সত্য।

কিন্তু ও-অপবাদ যদি পুরোপুরি সত্যি নাও হয়, তবুও তাতে আমাদের লাভের ঘরে শূন্য পড়ে না। আমাদের অতীতের প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত করাই একটা মস্ত কাজ। তা করতে গিয়ে যদি কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলার কাজ হয়ে থাকে—যদি আমরা সংস্কৃত পাশ থেকে মুক্ত হ'য়ে ইংরেজি "নেট্"এ গিয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকি, তবুও তাতে আমরা লাভের ঘরে ফাঁকি পড়ি নি। কেননা অতীত ও পূর্ব্ব-পুরুষের আদেশ আমাদের যেমন করে চেপে ধরেছিল, বর্ত্তমান ও অপর পুরুষের উপদেশ আমাদের নিশ্চয়ই তেমন করে' চেপে ধরতে পারবে না। যে গতির কথা পূর্ব্বে বলেছি, সেই গতিই আমাদের বাইবেল বর্জ্জন করবার সম্ভাবনাকে অবিরাম জাগিয়ে রাখবে। আর বাইবেলের চাপ ঠেলে বের হওয়া, বেদের চাপ ঠেলে বের হওয়ার চাইতে বহু পরিমাণে সহজ হবে। কেননা বাইবেলের পিছনে আমাদের স্বজাতীয় ঋষিও নেই বা বিজাতীয় অহঙ্কারও নেই! সুতরাং পদে পদে সেখানে আমাদের আত্মগৌরবের মায়া-মরীচিকার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে না। সুতরাং বেদের ধমক থেকে যদি আমরা বাইবেলের চমকে গিয়ে পড়েই থাকি, তবে সেটা frying-pan থেকে fire-এ পড়া হয় নি—সেটা হয়েছে fire থেকে frying pan-এ ওঠা। সুতরাং ও-একটা লাভই।

কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন তুলতে পারেন,—ইংরেজ যদি দেশে না আস্‌ত, ইংরেজি যদি আমরা না শিখতেম, তবে কি আমাদের জাতটা মহাপ্রলয়ের তারিখ পর্য্যন্ত গতানুগতিকের দাসত্ব করেই কাটিয়ে দিত ?—এর উত্তরে আমরা বিনীত ভাবে শুধু এইটুকু নিবেদন করব যে, আমাদের বিচার-তর্ক যা ঘটেছে তাই নিয়ে,—যা ঘটতে

পারত, বা ঘটতে পারা উচিত ছিল, তা নিয়ে নয়। যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি ভবিষ্যৎ বাণীও শুনতে হয়, তবে অবশ্য উত্তরপক্ষের মেড়া বলে চুপ মেরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই!

তবে একথা স্পষ্ট সত্য যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে পরিমাণ লাভ আশা করা যেতে পারত, সে পরিমাণ লাভ আমরা পাই নি। যে শক্তি আমরা সেখানে খরচ করি, তার অনুপাতে ফল আমরা পাই নে। এবং তার কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির ও নানা মানুষের নানা মত থাকতে পারে এবং আছে। সে কারণগুলো যে কারণই হোক্ না কেন, তা শুধু এই-ই প্রমাণ করে যে, ঐ কারণ-গুলো না থাকলে আজ আমরা যে লাভ পাচ্ছি তার চাইতে ঢের বেশী ও বড় লাভ আমরা লাভ করতেম।

অবশ্য এই অল্প লাভে আমরা তুষ্ট নই। স্বল্পে সন্তুষ্ট ত হয় একমাত্র শূদ্র-মন। সুতরাং আজ আমরা আমাদের বিদ্যা-মন্দির নিজ হাতে গড়ে' তুলতে চাই। কিন্তু পলিটিক্যাল হট্টগোলে তা করা চলবে না কিছুতেই। তা করতে হ'লে চাই সমাজমনের একটা গভীর সত্য ও একটা গভীর সত্ত্বা,— যে সত্য আমাদের পথ দেখাবে, ও যে সত্ত্বা আমাদের শক্তি দেবে। বলা বাহুল্য প্রথম থেকে যদি আমরা সত্য দেখতে অস্বীকার করি, তবে শেষ পর্য্যন্ত আমরা অন্ধকারই সৃজন করে করে চলব। পলিটিক্স প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, বড় জোর প্রতিমা গড়তে পারে। প্রাণহীন প্রতিমা দান করতে পারে, না বর না অভয়। সাময়িক পলিটিক্সের বলদ জুড়ে বিদ্যা-রথ চালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হবে এই কারণে যে, পলিটিক্সটা হচ্ছে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মানবের কর্ম্ম, কিন্তু বাণীর মন্দির গড়াটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ মনের ধর্ম্ম।

(৫)

আমি এ প্রবন্ধের পূর্ব্বে একজায়গায় বলেছি যে Slave-mentality ইংরেজিতে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার বাঙলা করলে দাঁড়ায়, দাস্য-ভাব নয়, শূদ্র-আত্মা। পাটনা "সবুজ-সঙ্ঘে" শ্রীযুক্ত রঙিন হালদার মহাশয় দাস্য-ভাবের গুণগান করেছেন, এবং তা গেল চৈত্রের "সবুজ পত্রে" ছাপা হয়েছে। শূদ্র-আত্মা ও দাস্য-ভাব এক-সঙ্গে জড়িয়ে নেবার আশঙ্কা এ দেশে আছে। কেননা এ দুটো জিনিষ দেখতে একরকমই লাগে। সুতরাং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলবার চেষ্টা করলে আশা করি অপ্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হবে না।

দাস্য-ভাব কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আর কতগুলো কথাও মনে পড়ে যায়— যেমন সখ্য-ভাব, বাৎসল্য-ভাব, মধুর-ভাব ইত্যাদি। কথা-গুলো সবই বিশেষভাবে বৈষ্ণব সাধনার ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের। বৈষ্ণব সাধনা ভক্তি-মূলক। এই ভক্তিই রূপান্তরিত ও রসান্তরিত হ'য়ে কখনও প্রেমে কখনও স্নেহে পরিণতি লাভ করে। বলা বাহুল্য ওর প্রতিটীরই মূল লক্ষ্য ও শেষ ফল আনন্দানুভূতি। সব সাধনারই মূল লক্ষ্য ঐ—অর্থাৎ হয় দুঃখ-নাশ নয় আনন্দ-লাভ। তবে বৈষ্ণব-সাধনার একটা প্রধান গুণ এই যে, তা বিশেষ করে' মানবীয়; বৈষ্ণব-সাধনা মানুষের অন্তরকে জয় করতেও বলে না, ক্ষয় করতেও বলে না,—বলে তাকে দিব্য-মূর্ত্তি দান করতে। মানুষের পিতৃত্ব মাতৃত্ব সখাত্ব সখীত্ব প্রণয়িনীত্ব দাসত্ব ইত্যাদি চিরন্তনের যে ধর্ম্ম আছে, তাকে পরিহার করে' নয়—তাকে আশ্রয় করেই, তার ভিতর দিয়েই বৈষ্ণব

চরম ও পরম আনন্দের উৎসে পৌঁছিতে চায়। সুতরাং তার সাধনা, দ্বৈতের সাধনা। সুতরাং তার জন্যে চাই একজন উপলক্ষ্য। বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণকেই সেই উপলক্ষ্য-পদে স্থাপিত করেছে। কেননা তার মতে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই পরম-পুরুষের সাকার অবয়ব—সুঠাম, সুন্দর ও শাশ্বত।

সুতরাং দাঁড়াল এই যে, ঐ সখ্য বাৎসল্য মধুর দাস্য ইত্যাদি ভাবের পিছনে আছে সাধকের অনুভূত একটা নিবিড় প্রেম—যেটাকে বলা যেতে পারে দিব্য প্রেম। কেননা এই প্রেম যে-কেউকে ও যা-কিছুকে স্পর্শ করে, সবকেই স্বর্লোকের মূর্ত্তি প্রদান করে। দিব্য প্রেম এই দাস্য-ভাবের পিছনে আছে বলে', ও শূদ্র-আত্মার পিছনে নেই বলে', দাস্য-ভাবের দাসত্বে ও শূদ্র-আত্মার দাসত্বে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। কেবল তাই নয়,—শূদ্র যতদিন শূদ্র, ততদিন ঐ দাস্য-ভাব তার পক্ষে সত্যও হতে পারে না, সহজও হ'তে পারে না—সত্য ও সহজ হ'তে পারে কেবল দাস-ভাব। মানুষের নিম্নগা প্রকৃতিকে টেনে তুলে দিব্যলোকে স্থাপিত করবার জন্যে যে শক্তি ও সামর্থ্য দরকার, তা শূদ্রের আয়ত্তে কখনও আসতে পারে না। কেননা শূদ্রের ধর্ম্ম হচ্ছে স্বল্পের ধর্ম্ম—মর্ত্ত্যের ও অপশক্তের। অবশ্য শূদ্র-আত্মার স্বধর্ম্ম উদ্‌যাপনের মধ্যেও একটা সার্থকতা ও আনন্দ আছে। কিন্তু দাস্য-ভাবের দাসত্বে ও শূদ্র-আত্মার দাসত্বে যে কি প্রভেদ, তা যে জানে সেই-ই জানে। ওর একটা হচ্ছে স্বর্লোকের আলোকে উজ্জ্বল ও মহীয়ান, আর একটা হচ্ছে ভূলোকের আত্মীয়তায় অক্ষম ও কুণ্ঠিত। সুতরাং ওর একটার সঙ্গে আর একটার যে মিল, তা কেবল অক্ষরে—অর্থে নয়। এটা আমাদের যত বেশী খেয়াল থাকে ততই মঙ্গল।

কিন্তু ব্যক্তিগত সাধনার দিক থেকে এই দাস্য-ভাবের যে মূল্য ও যে অর্থই থাক্ না কেন, এই এক দাস্য-ভাব নিয়ে সমাজ চলে না। দাস্য-ভাবের মূল্য ও মহত্ত্ব ততক্ষণই সিদ্ধ ও সার্থক হ'য়ে থাক্‌বে, যতক্ষণ সারা জগত তার সেবা গ্রহণ করবার উপযুক্ত। সেবা-গ্রহণেরও যে অধিকারী-ভেদ আছে, তা ত আমরা হিন্দুরা সবাই জানি ও মানি। অনধিকারীকে দান করলে যে গ্রহীতার অমঙ্গল ও দাতার অধঃপতন, এটা হাতে কলমে প্রমাণ করা যায়। আজকের পৃথিবী যে সেই সেবা-গ্রহণ করবার অধিকারী নয়, তা আমরা চর্ম্ম-চোখেই দেখতে পাই। আজও সমাজের নানা প্রয়োজনের দরকার রয়ে গেছে। সুতরাং আজ সমাজে নানা লোকের, নানা ভাবের, নানা ধর্ম্মের প্রয়োজন। সুতরাং কেবল এক দাস্য-ভাবকে ধর্ম্ম করে' তুললে, সমাজের মানে আজ ব্যর্থ হবেই হবে। যদি এমন সময় কোন দিন আসে যে, সারা পৃথিবী পরমপুরুষত্ব লাভ করে শান্তং শিবং সুন্দরং হ'য়ে উঠেছে, তবে সেইদিন, কেবলমাত্র সেই দিন সমস্ত সমাজকে সমস্ত জাতিকে দাস্য-ভাবের সাধনা করবার উপদেশ দেওয়া চলতে পারবে। আজ কেবল দাস্য-ভাব নিয়ে কোন সমাজের বিশ্বমানবের সেবা করা চলবে না, কেননা তাহলে সে সমাজকে তলিয়ে যেতে হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দেশের শিক্ষা

—:০:—

দেশের শিক্ষা নিয়ে দেশের লোকের মনে একটা ঝড় উঠেছে। এই ঝড়ের চোটে এত উদ্দাম মতামত ও কল্পনার ধূলো ঘরে বাইরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেচে যে পণ্ডিতরাও চোখে ঝাপ্‌সা দেখচেন। কাজেই ঝড় না একটু পড়ে' আসা পর্য্যন্ত এত অদ্ভুত আর এত বিচিত্র কথা আমাদের শুনতে হবে, যে মোটেই অসহিষ্ণু হলে চলবে না।

যে শিক্ষার স্রোত আজ পঞ্চাশ বছর ধরে এই ভারতভূমি দিয়ে বইচে, তা যে যুগপৎ সঙ্কীর্ণ ও পঙ্কিল, তাতে করে আমাদের যে তৃষ্ণারও নিবৃত্তি হচ্চে না—স্বাস্থ্যও উন্নত হচ্চে না, এই হচ্চে আমাদের অধিকাংশ লোকের মত এবং বলা বাহুল্য সম্পূর্ণ একমত না হলেও—মোটের মাথায় তাঁদের সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ নেই। শিক্ষার মাত্রা ও উপাদান এ দুটোকেই যে একটু বদ্‌লানো দরকার তা তাঁরাও বলচেন, আমিও বলি। কিন্তু কেন আমরা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির উপর হঠাৎ এতটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলুম? কি করে আমরা আবিষ্কার করলুম যে আমাদের বিদ্যালয় আমাদের মনকে ফাঁসি দিচ্চে? এ সম্বন্ধে পরোক্ষ প্রমাণই আমাদের বেশীর ভাগ লোকের সম্বল। একদল সেন্‌সাস্ রিপোর্ট হাতে নিয়ে শিক্ষার ওজনটা এঁচে নিচ্চেন আর একদল আর্থিক অবস্থার কষ্টিপাথরে কষে শিক্ষার মুল্য বের করেচেন। অবশ্য সিদ্ধান্ত দুদলেরই সত্য কিন্তু বিচার প্রণালীটা

ঠিক—যুক্তিসম্মত নয়। যাদের বর্ণজ্ঞান আছে তারাই যে শিক্ষিত আর যারাই নিরক্ষর তারাই যে অশিক্ষিত এমন কোন বাঁধা ধরা নিয়ম জ্ঞানরাজ্যে নেই। তবে যে হেতু আমাদের দেশে শিক্ষা জিনিষটা সম্পূর্ণ পুঁথিগত সুতরাং সেন্‌শাসের এ উক্তিকে অনুমোদন করতেই হবে যে শতকরা ৯২ জন পুরুষ ও ৯৯ জন স্ত্রীলোক একেবারেই অশিক্ষিত। তারপর দেশের দারিদ্র্য দুরবস্থার সঙ্গে শিক্ষার যে একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাত আছে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত নই আমাদের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান জীবিকাদৈন্যের জন্য শিক্ষাই যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী এমন কথা তিনিই নির্ভয়ে বলবেন যিনি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর আর কতকগুলি কারণের প্রতি অন্ধ। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য যে রীতিমত সুশিক্ষার প্রসার দেশ কে অর্থশালী করে না তুললেও তার অভাব দেশকে নিঃস্ব করবেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য যাই হোক্ তার একটা ধ্রুব পরিণাম হচ্চে মানুষকে জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে তৈরী করা। সুতরাং শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় একথা অসঙ্কোচেই বলা যেতে পারে যে "জ্ঞানের ভাণ্ডার ধনের ভাণ্ডার না হলেও যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভাঁড়ে ও ভবানী।"

যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে আমাদের শিক্ষার অভাব অভ্রান্তভাবে বোঝা যায়—সে হচ্চে অন্য সভ্য দেশের সঙ্গে তুলনা। ইউরোপের একজন কৃষক রমণীর ও যে মোটামুটি সর্ব্ববিষয়ী জ্ঞান আছে তা আমাদের অনেক শিক্ষাভিমানী ভদ্র-সন্তানের ও নেই। যাঁরাই ঘরের গণ্ডীর বাইরে একপা বাড়িয়েচেন—তাঁরাই হলপ করে বলে থাকেন যে সে দেশের শিক্ষার fact-এর জ্ঞান যত হোক্ না হোক্

principle-এর জ্ঞান বেশী হয়, ফলে সে দেশের অল্প শিক্ষিতেরাও যে স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় দেন তা এদেশের তথা কথিত উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যেও বিরল। তবে একথা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত যে শিক্ষার একটা বড় রকম বনেদী সংস্কার এ দেশের পক্ষে দরকার হয়ে উঠেচে। কিন্তু কি রকম বনেদী সংস্কার দরকার সে সম্বন্ধে যার যে রকম বনেদী সংস্কার তিনি সেই রকম মত জাহির করচেন। একদল পণ্ডিত শিক্ষার নিষ্ফলতা দেখে এতই হাড়ে হাড়ে চটে গিয়েচেন যে তাঁরা অসঙ্কোচে এবং মুক্তকণ্ঠে একথা প্রকাশ করচেন যে শিক্ষায় এখন আমাদের আর প্রয়োজনই নেই। তাঁদের মতে স্বরাজ্য লাভই এখন আমাদের একমাত্র কাম্য এবং তদুপযোগী কর্ম্মই একমাত্র কর্ত্তব্য। স্বরাজ্য লাভ যে কাম্য তা কে অস্বীকার করবে কি তাই যে আমাদের একমাত্র কাম্য বা সেই কল্পতরু থেকেই যে আমরা শিক্ষার সমস্ত সুফল বিনা প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত হবো, এ বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস শিক্ষার সুফল এক শিক্ষাই দিতে পারে, যদি, সে শিক্ষা সুশিক্ষা হয়। স্বরাজ্য মূলক স্বাধীনতা কেবল শিক্ষার গাছের উপর থেকে খানিকটা আওতা সরিয়ে দিয়ে তাকে ফলবান্ হতে সাহায্য করে। দেশের সমস্ত লোক যদি পুঁথিপত্র বন্ধ করে স্বরাজ্যের প্রতীক্ষায় উত্তর-কালের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে, তা'হলে দেশের স্বরাজ্য ও যে শীঘ্র হস্তগত হবে, এমন কোন নজির নেই; উপরন্তু মনের স্বরাজ্য থেকেও আমরা অনেকটা বেদখল হয়ে পড়বো। শিক্ষা জিনিষটা স্বাধীনতার পরিপন্থী ও নয়, তার অপেক্ষাও রাখে না। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ঠিকই বলচেন "দেশের স্বরাজ্য পরের কাছ থেকে হাত পেতে পাওয়া যায় কিনা জানিনা কিন্তু একথা আমি খুব জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারি, যে মনের স্বরাজ্য নিজ হাতে গড়ে তুল্‌তে হয়।" তা ছাড়া স্বরাজ্যের লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে যদি আমরা শিক্ষার রাজবেশ খুলে ফেলে দিই তাহলে কি ব্যক্তিগত কি জাতীয় মুক্তি কেউই এনে আমাদের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেবেন না। আমি জানিনা সে স্বাধীনতার মূল্য কি যাতে মনুষ্যত্বের না বিকাশ হয় এবং মনুষ্যত্বই যে সমস্ত সম্পদের একমাত্র বাহন তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার কর্ব্বেন না। স্বাধীনতা তাদেরই ভোগ্য এবং তারাই বজায় রাখতে পারে যারা চরিত্রে মনে সুশিক্ষিত।"

আর একদল পণ্ডিতের মতে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্চে সুচারুরূপে জীবিকানির্ব্বাহ সুতরাং যে বিদ্যা অর্থকরী নয় তার চর্চ্চা একেবারেই নিরর্থক। তাঁদের মতে Technical school এবং Scientific college-ই আমাদের সমস্ত জাতকে ঋদ্ধির পথে নিয়ে যাবে—কাব্য, ইতিহাস শিল্প, দর্শনে মনঃশক্তির অপচয় করা মানে অপমৃত্যুকে বরণ করা। জীবন সংগ্রামে দাঁড়াতে হলে সেই সরস্বতীকে আমাদের পুষ্প চন্দন দিতে হবে যিনি লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্নাত্মা—কারণ অপসরস্বতীর প্রসাদ উপবাস। এ সম্বন্ধে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে দেশের মৃত্যুই একমাত্র মৃত্যু নয়—আত্মার মৃত্যু আরো ভয়ঙ্কর, আরো শোচনীয়। আত্মাকে উপোষী রেখে শুধু দেহের পরিপোষণ করলে—দেহরক্ষা হতে পারে আত্ম-রক্ষা হয় না। যে culture সভ্যতার একটা উচ্চাঙ্গ তাকে ছেঁটে ফেল্লে আমরা যে মানুষের আকার নিয়েও মানুষ থাকবো না তা নিশ্চিত। utility-র ক্ষুদ্র তুলাদণ্ডে জ্ঞানের সার্থকতা মাপা যায়

না। তা ছাড়া এটাও নাকি একটা পরীক্ষিত সত্য যে খালি Technical এবং Scientific শিক্ষার চাবিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খোলে না। একটা সোজা উদাহরণ দিলেই এ সত্যটা স্পষ্ট করে বোঝানো যাবে। আইন একটা অর্থকরী বিদ্যা। কিন্তু কেবল আইনের জ্ঞানে অর্থোপার্জ্জন হয় না। যে বিদ্যায় মানুষের তর্কশক্তিকে উদ্বোধিত করে, যে বিদ্যায় মানুষের মনস্তত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, যে বিদ্যায় মানুষকে নির্ভীক ও চরিত্রবান করে, কৃতী আইনজ্ঞের সে সব বিদ্যাও দরকার। অবশ্য এমন দু'একজন কৃতী আইনজ্ঞ আছেন, যাঁরা কি চরিত্র কি মনস্তত্ত্ব কিছুরই ধার ধারেন না, কিন্তু তাঁদের অর্থোপার্জ্জন অনেকটা লটারিতে টাকা পাওয়ার মত ভাগ্যসাপেক্ষ। দেশের আর্থিক উন্নতি জুয়োখেলা নয়।

তবে একথা ঠিক যে কেবল General education মানুষকে জ্ঞানী করলেও কর্ম্মী করে না। General education-এর প্রশস্ত ভিত্তির উপর বিশেষ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। আমাদের দেশের একটা স্বাভাবিক প্রবলতা আছে General education-এর দিকে যাতে করে আমরা বিশেষ বিজ্ঞানকে—অবজ্ঞা না করলেও অনেকটা উপেক্ষা করি। এই উপেক্ষাই যে আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার একটা প্রধান কারণ তা অস্বীকার করবার জো নেই। আমাদের বেশী ঝোঁক দিতে হবে এখন বিশেষ বিজ্ঞানের দিকে—এবং তার মধ্যেও বিশেষ করে জড় বিজ্ঞানের দিকে, কেননা জড়ই হচ্ছে জগতের আদিতত্ত্ব। এবং জীবনের ক্ষেত্রেও জড়ের কাঁধে ভর দিয়ে আত্মাকে দাঁড়াতে হয়। জড়-

বিজ্ঞানের কৃপাতেই আমাদের অসাড়, পঙ্গু, অকর্ম্মণ্যদেহের জড়ত্ব যদি ঘুচে যায়।

তৃতীয় আর এক দলের পণ্ডিত আছেন যাঁরা সেই শিক্ষা ফিরে আনবার জন্য আমাদের উপদেশ দেন, যা বিদেশী শিক্ষার আমদানীর পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিরাজমান ছিল। এক কথায় তাঁরা বলেন যে স্কুল কলেজ থেকে জ্ঞানের চাষ উঠিয়ে দিয়ে—টোলের মধ্যেই তার আবাদ করা হোক্, কেননা সে আবাদে সোণা ফল্‌তে বাধ্য। জানিনা টোলের আবাদে কোন যুগে সোণা ফলেছিল কিনা কিন্তু এ যুগে যে তা ফল্‌বেনা তা নিশ্চিত। আমাদের জীবনের চাকা যতই আস্তে ঘুরুক, টোলের যুগ থেকে অনেক এগিয়ে এসেচে; আর যে হেতু জাতীয়-জীবন থেকে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই জন্য টোলের শিক্ষায় ফিরে যেতে হলে জাতীয় জীবনকেও একশো বছর পিছিয়ে যেতে হবে। সনাতন প্রথাকে চিরন্তন করবার চেষ্টাই গতিশীলতার প্রতিকূল, কাজেই উন্নতির অন্তরায়। নব্য ন্যায় আর মুগ্ধবোধের কঙ্কালের—উপর যদি আমাদের নব সাহিত্যের প্রতিমাকে গড়ে তুল্‌তে হয় তা হলে আর যাই হোক্—তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে না। তা ছাড়া "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরিয়সী" এই বীজ মন্ত্রের উপরও আমরা বিশ্বাস হারিয়ে বসেছি। ওহেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যত মন্দিরই আমরা গড়িনা কেন তার অচলায়তন ভূমিসাৎ হতে বাধ্য।

সকল দেশেই শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে যুগে যুগে Experiment চলে এবং তার ফলে যুগে যুগেই শিক্ষাপদ্ধতি বদলায়—কিন্তু আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি যদি অতীত কি বর্ত্তমানের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে

তা হলে বুঝতে হবে, আমরা জাতকে জাত মরে গেছি। আমাদের ideal, সমস্যা, আশা, ভরসা সবই যখন বদলাচ্চে তখন সাবেকী শিক্ষাতে ও আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না, হালি শিক্ষাতেও নয়। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাপদ্ধতিকেও যদি আমরা আলাদিনের বাড়ীর মত হুবহু তুলে এনে আমাদের দেশে বসাতে যাই তাহলেও ভিতের বাঁধন নেই বলে তা দুদিনেই ঘাড়মোড় ভেঙ্গে পড়ে যাবে। আমরা চাই আমাদের জাতীয় বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে—একটা নূতন শিক্ষাপদ্ধতি একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে—আমরা চাই এমন একটা সৃষ্টি যা বিদেশী জ্ঞানকে দেশের উপযোগী করে, অতীতের জ্ঞানকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে। কাজেই নমুনা আমরা পাঁচটার জায়গায় দশটা দেখতে পারি কিন্তু নকল একটার ও করতে পারি না।

(৩)

আমি আগেই বলেছি দেশের লোককে যথার্থ সুশিক্ষিত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে—প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির একটা বড় রকম সংস্কার আবশ্যক, কতখানি সংস্কার আবশ্যক তা জানতে হলে জীর্ণস্থান গুলোকে আগে লক্ষ্য করা চাই। প্রথমতঃ প্রাথমিক শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এত অল্প যে তাতে এই বিরাট জনসংঘের মুষ্টিমেয়েরও স্থান সঙ্কুলান হয় না। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার কল্পে গভর্ণমেণ্টের চিরকারিতাকে আমরা যতই দোষ দিই না কেন, আমরাই তার প্রয়োজনীয়তা এখন ও ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করিনি এবং তা করিনি বলেই আমরা চাষার ছেলেদের

লেখাপড়া শেখাতে এতটা বেশী নারাজ। একটা নূতন পাঠশালা কি একটা নূতন নাইটস্কুল স্থাপিত হয়েচে শুনলেই আমরা আশঙ্কার সঙ্গে পরস্পরের মুখ চেয়ে বলি "এইবারই সেরেচে। তখনিই চাকর মজুর পাওয়া যায় না, তার উপর যদি ছোটলোকেরাও লেখাপড়া শেখে তা হলে মান সম্ভ্রম বাঁচানো দায় হবে।" অর্থাৎ আমরা বলতে চাই যে ঐ তথাকথিত ছোটলোকেরা চিরকাল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যেই বসে থাকুক আর আমরা যদৃচ্ছাক্রমে তাদের উপর অত্যাচার করি জুলুম চালাই। আমরা চাই তারা আমাদের পা জড়িয়ে কেঁদে হুজুর হুজুর করবে, আর আমরা তাদের লাথিমেরে খাটিয়ে নেবো। এই মনোভাব আর দাস মনেভাব যে, একই জিনিষের এ পিঠ ও পিঠ, তা বলাই বাহুল্য কিন্তু এই অনুদার স্বার্থ-পরতায় আমরা যে আমাদেরই জাতীয় স্বার্থকে—বিসর্জ্জন দিচ্চি তা আমরা ভাবি না। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি যত বিস্তৃত হবে উচ্চ-শিক্ষার চূড়াও ততই উন্নত হবে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য আমাদের গোড়াতে অনেকখানি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-ত্যাগ করতে হবে। অবশ্য আমি একথা বলচি না যে, যে ছাঁচে এখন প্রাথমিক শিক্ষা ঢালাই হচ্চে সেই ছাঁচই আমাদের বাহাল রাখতে হবে। সে ছাঁচের প্রথম দোষ হচ্চে স্থান নির্ব্বাচন। বিদ্যালয় বললেই আমরা বুঝি ইঁটের পাঁচিল ঘেরা, টেবিল বেঞ্চি সাজানো একটা রুদ্ধ স্থান যেটাকে পাঠাগার মনে না করে কারাগার মনে করলেও বড় বেশী দোষ হয় না। মুক্ত প্রকৃতির সজল সবৃক্ষ প্রশস্ত শ্যামল অঙ্কই মানবশিশুর মনোগঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান—জীবনের সজীব প্রফুল্লতার মধ্যেই পর্য্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, কৌতূহল

প্রভৃতি জীবনের ক্রিয়াগুলো আপনা হইতেই এসে পড়ে, জীবনী শক্তিও বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া ঘরের মধ্যে বসে যতই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যাক্ না কেন বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না। টেবিলের উপর কমলানেবু রেখে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করলে ছেলেদের মনে, কমলানেবুর জ্ঞান ততটা বিশদ হয় না যতটা হয় কমলানেবুর বাগানে তাদের ছেড়ে দিলে। তারা আকার এবং বর্ণ ছাড়া আরো কিছু জানতে চায়—যা হচ্চে গন্ধ, স্পর্শ, রস। কমলানেবুর গাছ থেকে কমলানেবুর বিচ্ছিন্ন জ্ঞানটাও তাদের পক্ষে আদৌ রুচিকর নয়, আর কমলানেবুর রং যে গাঁদাফুলের রংএর মতই এ জ্ঞানটা তারা শিক্ষকের মুখে না শুনে নিজের চোখেই দেখতে চায়। তা ছাড়া যখনই তাদের মনে হয় কমলানেবু তাদের পড়াশুনারই একটা অঙ্গ এবং সেইজন্যেই বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করেচে, যখনই মনে হয় ঐ কমলানেবু সম্বন্ধে ভ্রম প্রমাদই বেত্রাঘাত না হোক্ রক্তচক্ষু ও ভ্রূকুটী গর্জ্জনের কারণ হতে পারে তখনই কমলানেবুর রং হয়ে যায় ফেকাশে, স্বাদ হয়ে যায় তেতো, বোধ হয় স্পর্শ ও হয়ে যায় নীরেট নীরস কাঠের বলের মত। অনেক প্রাথমিক স্কুলে কিন্তু বস্তু পরিচয়ের এ প্রহসনেরও অভিনয় হয় না। সেখানে কেবল নামের সঙ্গেই কারবার, বানান প্রতিশব্দ নিয়েই মারামারি কণ্ঠস্থ করাতেই শিক্ষার পরিসমাপ্তি। তা ছাড়া যাদের উপর শিশুদের মন গড়ে তোলবার ভার তাঁদের নিজেদের মনই গড়ে ওঠেনি তা প্রাথমিক স্কুলের যে কোন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করলেই বোঝা যায়। শিশুদের মনে শিক্ষার ছাপের আগে শিক্ষকের ছাপ পড়ে, তাদের নির্ভর শিক্ষকের উপর অগাধ, তাই তাদের সামনেই সব চেয়ে বড়

শিক্ষকের আদর্শ ধরা চাই। শিশুর সঙ্গে শিশুর মত মিশে, শিশুর ভাষায়, শিশুর প্রণালীতে, বড় বড় জ্ঞানকে শিশুর গ্রহণযোগ্য করে এগিয়ে দিতে পারেন এমন কৌশল, এমন সহানুভূতি এখন চরিত্র কজন শিক্ষকের আছে? যাঁদের আছে তাদের উচ্চ শিক্ষা বিভাগে না নিযুক্ত করে শিশুশিক্ষা বিভাগেই নিযুক্ত করা উচিত, উচ্চশিক্ষার্থীদের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শিক্ষক হলেও চলতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই গাম্ভীর্য্য হানির ভয়ে কঠোর বিভীষিকার মত, আত্মসম্ভ্রমের উচ্চ মঞ্চের উপর বসে থাকেন—সুতরাং তাঁরা ছেলেদের মনে যে ভাবের উদ্রেক করেন, তা ভক্তিও নয়, প্রেমও নয়, অন্য কিছু এবং সে ভাবটা যে একটা তামসিক-ভাব, সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়, তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া শিক্ষার বিষয়ের উপর শিশুদের মনে যে প্রেমের সঞ্চার করা দরকার তা কখনই করা হয় না, কেন না শিক্ষকের মনেই সে প্রেমের একান্ত অভাব। এইজন্যে তাঁরা নিজের সুবিধা মত গাড়ীর পিছনেই ঘোঁড়া জুতে দেন, অর্থাৎ সাধারণ সত্য থেকেই বিশেষ-সত্যে অবতরণ করেণ যদিও তার উল্টো গতিটাই হচ্চে মানব মনের স্বাভাবিক গতি।

(৪)

নিম্ন শিক্ষা সম্বন্ধে যে সব কথা প্রয়োজ্য তার অনেকটা মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও খাটে, উচ্চ শিক্ষার সম্বন্ধেও খাটে। কেবল বিদ্যালয়েরই ঈপ্সিত সুফল ফল্‌তে পারে না, যদি না প্রত্যেক বিদ্যার্থীর বিশেষ অভাবগুলি দূর করা হয়। এ দেশের বিদ্যালয়গুলি

এম্‌নি ভাবেই পরিচালিত যে সব ছেলেদের একই ক্ষুরে মাথা মোড়ানো হয়ে থাকে। প্রত্যহ একই পাঠ সকল ছেলেকে দেওয়া হয়—একই ভাবে সকলকে বোঝানো হয়—যেন ক্লাস জিনিষটা কতকগুলি বিশেষ শক্তি সম্পন্ন বিভিন্ন বালকের সমষ্টি নয়, একটা গড় পড়তা কষা কাল্পনিক বালকের সমষ্টি। এতে করে ছুরি, কাঁচি, খোন্তা, কুড়ুলের মত এক একটী বালক এক একটী বিশেষ সার্থকতা নিয়ে বেরিয়ে আসেই না; এমনকি ফলে কলে-কাটা স্কুলের মত একই মূর্ত্তি একই উপযোগিতা নিয়ে—বেরিয়ে আসাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়—কেননা মানুষের মন আর যাই হোক্ ধাতু নয় এবং যদিও ধাতু হয় ধাতুগত পার্থক্য মনে মনে যথেষ্ট।—Syllalbus রূপ বাৎসরিক চক্রে সকল ছেলেকেই—পল্টনের মত একই তালে একই চালে পা ফেলে পরিভ্রমণ করতে হবে যাতে সকলেই এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারে—ঘোঁড়দৌড়ের ঘোড়ার মত কেউ এগিয়ে কেউ পেছিয়ে থাক্‌লে চলবেনা। এইজন্য Class promotion ব্যাপারটাও বৎসরের শেষে হতে বাধ্য—এবং এই ব্যাপারে সব ছাত্রকেই দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, এক যারা ক্লাসে উঠ্‌তে পার্‌লে আর এক যারা পার্‌লে না। এই দুই বিভাগের মাঝামাঝি স্তর একটাও নেই কাজেই যে সব বালক কোন একটা কি দুটো বিষয়ে সামান্য অপরিপক্ক বলে নীচের ধাপেই রয়ে গেল—তাদের ও আর আর অক্ষম বালকদের মত সারা বছরটাই বিজ্ঞাত বিষয়ের চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে বর্ষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে। আমার বিবেচনায় ক্লাসপ্রোমোসনরূপ কৃত্রিম জিনিষটাকে যদিও রাখতে

হয় তাকে এম্‌নি ভাবেই রাখা উচিত যাতে মাসে মাসেই প্রোমোসনের ব্যবস্থা থাকে এবং একই বালক যুগপৎ এক বিষয়ে উচ্চতর ক্লাসে আর এক বিষয়ে নিম্নতর ক্লাসের ছাত্র হতে পারে।

যে পরীক্ষায় বালকদের উচ্চতর ক্লাসে বা উচ্চতর শিক্ষায় উন্নীত করা হয় সে পরীক্ষা প্রণালী ও যে খুব আশাপ্রদ তা নয়। সকলেই জানেন এখানকার পরীক্ষায় বুদ্ধির পরীক্ষা ততটা হয় না যতটা হয় মুখস্থ শক্তির। যার যে পরিমাণে গলাধঃ করণ করবার ও উগ্‌রে দেবার শক্তি আছে, সেই সেই পরিমাণে বিদ্যার জয় পতাকা উড়িয়ে বিদ্যা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা ছেলেদের দেখ্‌লেই মনে হয় তারা এক একটী পেটেণ্ট করা গ্রামোফনের রেকর্ড।

আমাদের অনেকেরই ধারণা যে পরীক্ষায় পাশ করাই হচ্চে বিদ্যাজীবনের কৃতিত্বের নিদর্শন এবং সেই পাশের দরেই কি কর্ম্মক্ষেত্রে কি বিবাহক্ষেত্রে আমরা তাদের দর সাব্যস্ত করি, তাই তাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় ঐ পাশের বেড়াকে, কোনক্রমে লাফিয়ে পার হবার জন্যে। জ্ঞানের জমি মাড়াক্ না মাড়াক্, সেখানে তারা খুঁড়িয়েই চলুক্ আর গড়িয়েই চলুক্ তাদের দরকার শুধু মুখস্থ শক্তির প্রাণ-পণ চেষ্টায় ঝাঁপ ডিঙোনো। একদিকে পরীক্ষার প্রণালী তাদের ঐ সাধু উদ্যমকে সুমুখ থেকে উৎসাহিত করে, আর দিকে অধ্যাপনার প্রণালী ও পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাদের এগিয়ে দেয়। এ বিষয়ে শিক্ষক কে অধ্যাপক কে দোষ দেওয়া যায় না, কেননা তাঁদের কেরামৎ ও জীবিকা দুইই নির্ভর করচে ছেলেদের পাশের উপর। ফলে, তাঁরা এসঙ্গে সব ছেলেদের হাঁ করিয়ে নোট গেলাতে থাকেন,

তা সে গুরুপাক জিনিষ তারা জীর্ণ করতে পারুক্ আর নাই পারুক্। এসম্বন্ধে তাঁদের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করলে এই উত্তর পাওয়া যায় নোট না দিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেরা এত বিভিন্ন বিষয় ও এত স্তূপাকার বই আয়ত্ব করবে কি করে। এ উত্তরের আর কোন জবাব নেই। কিন্তু এ শিক্ষা প্রণালীর ফলে—"ছেলের যে শারীরিক ও মানসিক, মন্দাগ্নিতে" ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে বেরিয়ে আসে তার আর কোন চিকিৎসা নেই। এই শীর্ণদেহ ও জীর্ণমন নিয়ে বালকরা যে জাতির আশা ভরসাকে উদ্ধার করা দূরে থাক্ নিজেরাই সংসার তরঙ্গে হাবুডুবু খেতে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? মোট কথা শক্তি আর মুক্তি এ দুইই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বলতে হবে শিক্ষা প্রণালীর অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্যের বীজ দিন দিন ব্যর্থ হয়ে যাচ্চে।

(৫)

আগেই বলেছি প্রাথমিক শিক্ষায় বস্তু পরিচয় হয় না, কিন্তু তা বলে কেউ না যেন মনে করেন যে মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষায় সে অভাব পরিপূর্ণ হয়। আমার বিশ্বাস এই শেষোক্ত দুই শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মনের সঙ্গে বস্তুর সংসর্গ আরো কমিয়ে আনে। যে সব বিদ্যা একেবারেই বস্তুতন্ত্র সে সব বিদ্যার আকাশেও আমাদের বিএ বিএস্ সিরা এতটা নিরালম্ব হয়ে ঝুলচেন যে তাঁদের প্রশ্নোত্তরের কোটায় শূন্য না পড়লেও, জ্ঞানের কোটায় মহাশূন্য। একজন বি এস্ সিকে একবার আকাশের দিকে চাইয়ে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম "সপ্তর্ষি মণ্ডল কোনটা?" তাতে তিনি বিজ্ঞের মত অনেকক্ষণ খুঁজে খুঁজে কৃত্তিকা

নক্ষত্র দেখিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ দিনের বেলায় ছবিতে তারা দেখা ছাড়া রাত্রে আকাশে তারা দেখা বোধ হয় তাঁর সেই প্রথম। আর একজন বিএ পরীক্ষার্থী একবার আমাকে বলেছিলেন "ক্যালামাসরোটাং বলে একরকম লতানে তালগাছ আছে যা কখনো কখনো সাত শ হাত লম্বা হয়। অনুসন্ধানে জানলুম সে ক্যালামাস্ রোটাং বা রতন পাম আর কিছুই নয় আমাদের বেতগাছ অবশ্য এরকম ঠিকে ভুল হওয়া প্রশংসনীয় না হলেও অনিবার্য্য। দুর্ব্বোধ, দুরুচ্চার্য্য নামের তালিকা মুখস্ত করাই যেখানে পাণ্ডিত্যের "মিটার" সেখানে এর চেয়ে বেশীকি প্রত্যাশা করা যায়? তা ছাড়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মাতৃভাষা, জ্ঞান ও সত্যের বাহন হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তু ও মনের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য ব্যবধান থেকে যাবেই। আমরা যতই বিভাষালব্ধ জ্ঞানকে মনে মনে তরজমা করে নিইনা কেন, তবু সে জ্ঞান আলেয়ার মত দূরে দূরেই সরে বেড়াবে। পরভাষার পলকাটা কাচের মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞানের আলো মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তা সে জ্ঞানের স্বরূপ নয়, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছটা। তার মধ্য দিয়ে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করাও যা আর কাঁটা চামচে দিয়ে ভাত খাওয়া কি পরদার আড়াল থেকে কথা কওয়া ও ঠিক তাই সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতির বনেদী সংস্কার ততদিন কিছুতেই হতে পারে না যত দিন না বাংলা ভাষা আমাদের বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হয়। অবশ্য এ প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার যা প্রধান প্রতিবন্ধক সে বিষয়ে আমি যথেষ্টই সজ্ঞান, কিন্তু তা বলে হতাশ হলে চলবে না, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আমিও বলি—এবং আমার সঙ্গে সকলেই বোধ হয় বলবেন "বাংলা ভাষায় আমাদের বিদ্যার সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে এবং সে জন্য বহুশিক্ষিত

লোককে বহুদিন ধরে কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করতে হবে।” অবশ্য বিদেশীয় জ্ঞানকে আমাদের চিরদিনই অর্জ্জন করতে হবে, নতুবা আমার মনোরাজ্যে নিতান্ত একঘরে হয়ে পড়বো, বিশ্বসভ্যতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে এগোতে পার্বো না কিন্তু তার জন্যে ঐ সব জ্ঞানের ভাষাকে Secondary বা গৌণ ভাষা হিসাবে অধ্যয়ন করলেই কাজ চলে যাবে। উদ্দেশ্যকে যদি আমরা বিধেয়ের উপর স্থান দিতে শিখি তা হলে যে সব বিজ্ঞান দর্শনের জ্ঞান, এখন দুচারজন ইংরাজী শিক্ষিতের মাথায় ঘুরচে, দেশের গায়ে বসতে পারচে না, (কেন না ঐ ইংরাজী শিক্ষিতেরা কি ইংরাজীতে কি বাংলা ভাষায় সম্যকরূপে আত্মপ্রকাশে অক্ষম) তাই তখন বাংলার ও বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে। জাতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারকে খালি রাখলে জাতীয় জ্ঞানের কোন অর্থই হয় না।

(৬)

বাংলাভাষায় কাব্য সাহিত্য ছাড়া অন্য সাহিত্য গড়ে তোলবার একটা কোন বিধিবদ্ধ বা ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই এ পর্য্যন্ত হয়নি। কখনো কখনো সাময়িক পত্রিকায় দু একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বের হয়ে থাকে কিন্তু তা এতই আংশিক এতই খাপছাড়া যে তা উল্লেখ যোগ্যই নয়। যে দেশে ১৫৩ খানা মাসিক পত্র আছে এবং প্রতি মাসেই দু পাঁচখানার জন্ম মৃত্যু হয় সে দেশে এমন একখানা মাসিক পত্র নেই যা শুধু বিজ্ঞানের জন্যই উৎসৃষ্ট। আর বই? বাংলা ভাষায় জ্ঞানের বই নেই বল্লেই হয়। যা দু একখানা আছে তা এমন নীরস জটিল ও দুর্ব্বোধ পরিভাষায় পূর্ণ এমন নির্ব্বিচার বিষয়

সন্নিবেশে, ক্রমবিশৃঙ্খলায়, উদাহরণ দৈন্যে পরিমাণের অসামঞ্জস্যে, ও ভাষার সৌন্দর্য্যহীনতায়, শিক্ষার্থীর পক্ষে দন্তস্ফুটের অযোগ্য যে তাদের অস্তিত্ব থাকা না থাকা সমান। আমার এ আক্ষেপ যে কতদূর সত্য তা একজন নামজাদা বিজ্ঞান লেখকের দুচার ছত্র রচনা উদ্ধৃত করলেই বুঝতে পারবেন। লেখক প্রাকৃতিক ভূগোল নামক শিশুপাঠ্য পুস্তকে সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ বোঝাচ্ছেন—

“পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে—তাহার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এককালে পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু ইহাদের কিছুই ছিল না, সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া একটী বিশাল তেজোময় মণ্ডলাকার পদার্থ অনন্ত আকাশে আবর্ত্তন করিত, এই তেজোপুঞ্জ মণ্ডলাকার পদার্থ তেজঃ বিকীর্ণ করিয়া যত শীতল ও সঙ্কুচিত হইয়াছে, ততই উহার ঘূর্ণন বশত সময় সময় স্ফুলিঙ্গাকারে গ্রহগণ বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছে।”—

আর বেশী উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন নেই, যা করা হয়েচে তা হতেই রচনার প্রসাদগুণ সুষমা, শব্দবিন্যাস কৌশল এমন কি ভ্রান্তি-শূন্যতার ও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অথচ এই অমূল্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের একচত্বারিশৎ সংস্করণ হয়েছিল। যা হতে বোঝা যায় খুব কম হলেও অন্তত একচল্লিশ হাজার শিশুকে স্বাস্থ্যকর জ্ঞানের বড়ি বলে ঐ উৎকট ভাষাবৃত দুর্ব্বোধ বাক্যাবলি গেলানো হয়েচে। ধর্ম্মের নামে ইউরোপে এক সময় যে নিষ্ঠুর অত্যাচার চলতো, স্বাস্থ্যের নামে এদেশে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার কোথাও কোথাও এখনো চলে থাকে, জ্ঞানের নামে এ অত্যাচার তারচেয়ে যে নিষ্ঠুর নয়। আর একখানি বিজ্ঞানের বইথেকে আর একটী নমুনা উদ্ধৃত করবার

লোভ সংবরণ করতে পারচি না, যদিও সুখের বিষয় সেটা বাক্য নয় মাত্র একটা শব্দ, শব্দটী এই—"পতঙ্গবাহিত পরাগসঙ্গমশালী পুষ্প" যে পুস্তকে এই অদ্ভুত শব্দটী পাওয়া গেছে তা আট নয় বছরের ছেলেদের পাঠ্য একখানি বিজ্ঞান পাঠ। গ্রন্থকার ঐ শব্দ দিয়ে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের যে জ্ঞানটী তরুণ-মতি বালকদের মাথায় সরলভাবে ঢুকিয়ে দিতে চান তাকে ইংরেজীতে বলে insect-pollinated flower আর চলতি বাংলায় বলা যায়—"পোকায় যে ফুলের বিয়ে দেয়।" সাধুভাষার দুর্দ্দমনীয় চাপ থেকে সাহিত্যের নিষ্কৃতি যতটা বাঞ্ছনীয় শিশুদের নিষ্কৃতি তার চেয়ে ঢের বেশী বাঞ্ছনীয় কেননা ও সাধুভাষা শুধু ছেলেদের কাছে কেন তাদের অভিভাবকদের কাছেও গ্রীকভাষা। ঐ প্রাণহীন অবাস্তব সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ঠিকই বলেচেন—"ও ভাষার ছবিও নেই, জোর ও নেই, ও ভাষা অক্ষরের মধ্যে অক্ষর হয়ে বসে আছে।"

সরকারী বিদ্যালয়ের এ ভয়াবহ শিক্ষাপদ্ধতি থেকে দেশের লোককে মুক্ত করবার জন্যে যে সকল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এ পর্য্যন্ত হয়েচে তাদের সম্বন্ধে এখনও আমাদের ঠিক আলোচনা করবার অধিকার হয় নি, কারণ তাঁদের সংস্কৃতপদ্ধতি এখনো অনেকটা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত তবে যতটা বুঝতে পাচ্ছি, যে তা ঐ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটা অসরকারী সংস্করণ। সেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পড়ানো, সেই রুদ্ধ ঘরের বদ্ধ বাতাস, সেই এদেশের অনুপযোগী দশটা চারিটা ক্লাস, সেই চেয়ার সেই টেবিল, সেই পরীক্ষা, সেই সব, তফাৎ শুধু এই যে, ন্যাশন্যাল স্কুলে চরকা কাটানো হিন্দী পড়ানো হয়, যা সরকারী স্কুলে হয় না। এই ব্যবস্থা বালকদের

পক্ষে তপ্ত কড়াথেকে চুলোর মধ্যে পড়বার মত হয়েচে কি না তা সুধীদের বিবেচ্য। মিথ্যাই, ইউরোপের শিক্ষাশাস্ত্রীরা চীৎকার করে মরচেন যে চোদ্দো বছরের আগে ছেলেদের বিদেশী ভাষায় হাতে খড়ি দেবেনা ঐ বয়সের আগে বিদেশী ভাষা শেখানো আর দাঁত ওঠবার আগে মাতৃস্তন্য ছাড়িয়ে মাংস পোলাও খাওয়ানো একই কথা, মিথ্যাই তারা চীৎকার করে মরচেন, যে নীতিশিক্ষার স্থান বিদ্যালয় হলেও ধর্ম্মশিক্ষার স্থান মঠ; কেননা বিদ্যালয়ে যে ধর্ম্ম শেখানো যেতে পারে তা হচ্চে সর্ব্বজনীন বিশ্বমানবের ধর্ম্ম।

(৭)

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু এক্ষুদ্র প্রবন্ধের আঁটসাঁট গণ্ডীর মধ্যে তাদের টেনে আনবার অবসর নেই, শুধু একটী কথা আমি বলতে চাই যে সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান, সঙ্গীতশাস্ত্র, এবং যৌনবিজ্ঞান এই তিনটী অত্যাবশ্যক বিষয় এ পর্য্যন্ত তার পাঠ্যতালিকায় স্থান পায়নি কেন তার কোন সঙ্গত কারণ, আমি খুঁজে পাই না, অথচ এ তিনটী বিষয়ের জ্ঞান না হলে জীবন সুন্দর পবিত্র বা সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষার বিষয় বাহুল্যে ত কোনই ত্রুটী দেখা যায় না, অথচ এসব বিষয় যে শিক্ষনীয় নয় এই অমূলক, অর্ব্বাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেও কামশাস্ত্রের অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল, প্রাচীন গ্রীসেও বিদ্যার্থীদের সঙ্গীতশাস্ত্র অবশ্য শিক্ষনীয় বলে শিখতে হতো। তবে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিষয় আয়ত্ব করবার সোজা পদ্ধতি যতদিন না প্রচলিত হচ্চে অর্থাৎ যতদিন না মাতৃভাষায় বিদ্যার

আদান প্রদানের ব্যবস্থা হচ্চে ততদিন আমার এ প্রস্তাব অরণ্যে রোদন।

তারপর আর একটী কথা বলেই আমি এই ধৈর্য্যহানিকর প্রবন্ধ শেষ করবো। আমরা বিদ্যালয়ের কাছ থেকেই সব শিক্ষার প্রত্যাশা করি, কিন্তু এ রকম প্রত্যাশা অন্যায়। আমরা চাই বিদ্যালয় এবং একমাত্র বিদ্যালয়ই আমাদের যুবকদের সুশিক্ষিত করে কাজের লায়েক করে ছেড়েদেবে এবং কি তার সঙ্গে সঙ্গে কি তারপরে পশ্চাতে আর তাদের কোন শিক্ষার আবশ্যক হবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই অনেক বাপ মা ছেলেকে স্কুলে-ভর্ত্তি করে দিয়েই মনে করেন তাঁদের সব কর্ত্তব্য শেষ হলো। কিন্তু তা নয়। গৃহশিক্ষা আর সমাজশিক্ষাই হচ্চে ছেলেপিলেদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা, এবং সে শিক্ষার অভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কিছুই করতে পারে না, গৃহশিক্ষা যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিপূরক না হয় সমাজশিক্ষা যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষার উল্টো টান টানে তা হলে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। বলা বাহুল্য গৃহশিক্ষার মূল হচ্চে নারীশিক্ষা কেন না মাতৃ-কূলের কাছ থেকে সন্তানকুল তাদের জ্ঞানের রসটুকু সবচেয়ে আগে সবচেয়ে আনন্দের সঙ্গে, সবচেয়ে স্বাভাবিক উপায়ে টানতে শেখে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শতকরা—নিরেনব্বই জন রমনী অশিক্ষিত। শুধু অশিক্ষিত নয় অনেক স্থলেই কুশিক্ষিত। যদি বিদ্যা-লয়ের শিক্ষা তাঁদের পক্ষে অনুপযোগীই হয় তাহলে অন্ততঃ তাঁদের উপযোগী, তাঁদের হিতকর এমন সব বই তৈরী হওয়া দরকার যা তাঁরা বাজে নাটক নভেল ফেলে, গল্পের মতই আগ্রহের সঙ্গে পড়বেন, গল্পের মতই আনন্দের সঙ্গে ছেলেপিলেদের কাছে পড়ে শোনাবেন।

এ ছাড়া, সাবেকী কথকতার হয় ত এমন সংস্কার করলেও করা যেতে পারে যাতে ঐ লোকমান্য প্রণালী দিয়েই শুধু ধর্ম্মের নয়, ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, ইতিহাস সমস্তেরই জ্ঞান নিরক্ষর রমনীদেরও মনের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এরজন্যে মামুলী কথক সম্প্রদায়ের বদলে একদল নবতন্ত্রে দীক্ষিত নবশিক্ষায় শিক্ষিত—নবভাবে উদ্দীপিত কথক সম্প্রদায় গড়তে হবে। শিক্ষার আর একটী বাহনকে ও আমাদের বিশেষ করে সম্মান করা উচিত, যদিও তা বিদেশী ঔষধের মত বিদেশ থেকেই আমদানি। সেটী হচ্চে লাইব্রেরী এবং সে লাইব্রেরী সাধারণের জন্য অবারিত। স্কুল কলেজের বাঁধাধরা পাঠ্য ব্যূহের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে কৌতূহলী মন যখন অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন লাইব্রারী ভিন্ন তার আর স্বাধীন স্ফূর্ত্তির অবসর নেই। এই মনের হাঁসপাতাল" দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে না প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের কল্যাণ সুদূর পরাহত।

অনেকে আজকাল হাতে কলমে শিক্ষার কথা নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেচেন, কিন্তু তার স্থান ত ঠিক বিদ্যালয় নয়। হয় কৃষিক্ষেত্র না হয় কারখানা, না হয় ঐ রকম একটা কিছু। শিক্ষার সূত্রপাত হয় বিদ্যালয়ে কিন্তু সুশিক্ষিত লোক তাকে পরিসমাপ্ত করেন কর্ম্মজীবনের মধ্যে। বিদ্যালয় শুধু ভবিষ্যৎ শিক্ষার পথ প্রদর্শক তবে একথা ঠিক্ যে হাতে কলমে শিক্ষার পত্তনটা বিদ্যালয়েই করতে হবে। এই জন্যে ব্যায়াম ভূমির মত প্রতি বিদ্যালয়ের সঙ্গেই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র—আদর্শ—শিল্পশালা সংলগ্ন রাখা উচিত। তা ছাড়া শিক্ষকদেরও উচিত ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন

পশুশালা, মিউজিয়াম, কারখানা, প্রভৃতি শিক্ষার জীবন্ত লীলা-ভূমিতে নিয়ে যান—এবং কর্ত্তৃপক্ষদেরও উচিত যাতে ঐ সব স্থান ছাত্রদের জন্য অবারিত হয়। এর জন্য আমাদের শিক্ষিতদের আমাদের ধনীদের—আমাদের কর্ম্মীদের উঠে পড়ে কোমর বেঁধে লাগ্‌তে হবে—তা যদি না করি তাহলে আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধির স্বপ্নই দেখব এবং সে স্বপ্ন যখনই ভোরের কুয়াসার মত মিলিয়ে যাবে তখনই হয় সরকারকে নিন্দা করবো না হয় অদৃষ্টকে গালি পাড়বো—না হয় বিধাতার ঘাড়েই সমস্ত দোষ আর দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবো।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

রুশীয় কৃষক

—:*:—

আজ রবিবার। আইভানকয়া গ্রামের অধিবাসীরা অপরাহ্নে গ্রামের গির্জ্জার দক্ষিণে একটা খোলা মাঠে সমবেত হয়েছে। গ্রামখানি কৃষকের গ্রাম। বড়লোক নাই, বড়বাড়ী নাই। সাধারণের জন্য টাউনহলও নাই। সকলে মিলে কোন কাজ করতে হলে, এই মাঠেই করতে হয়। আজ "মীরের" একটা বিশেষ অধিবেশন আছে। রুশিয়ার গ্রাম্য সমিতির নাম "মীর" (mir)। গ্রামের সকলেই এসেছে। বালক বালিকারা হাসছে, খেলছে। স্ত্রীলোকেরা গল্প গুজব করছে। পুরুষেরা ছোট ছোট দল বেঁধে এখানে ওখানে বসে ফসলের অবস্থা, সম্প্রতি গ্রামে যে গো-মড়ক হয়ে গিয়েছে তাতে কার কটা গরু মরেছে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করছে। এমন সময় একজন তাদেকে ডাকলে। পুরুষেরা সকলে একত্র হল। কাজ আরম্ভ হল।

মেলনিকয়া। এক বৎসর হল পেট্রফকে "স্তারস্তা" (starosta) নির্ব্বাচিত করা হয়েছে, কিন্তু সে একদিনও "সেলস্কিখডের" কোন কাজ করলে না। অনেক আবশ্যকীয় কাজ বাকী পড়ে গিয়েছে। তার স্ত্রী এই খানেই আছে। তাকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করা হোক না? (প্রেট্রফ-পত্নীকে ডাকা হল)।

মেলনিকয়া। প্রেট্রফের খবর কি?

প্রেট্রফ-পত্নী। খবর আর কি? সে বাঁচে না।

বগোসলাফাস্কি। বাঁচে না কেন? হয়েছে কি? যে শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবে।

প্রেট্রফ-পত্নী। ভগবানের যা ইচ্ছে। আমার ত মনে হয় না যে সে আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে। "ফেল্ডশার" (Feldeher) তিনবার এসে দেখে গিয়েছে। ডাক্তারও একবার এসে ছিলেন, বললেন তাকে হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে।

মেলনিকফ। তা হাঁসপাতালে তাকে পাঠান হয়েছে?

প্রেট্রফ-পত্নী। কেমন করে পাঠান হবে? অতদূরে কে তাকে নিয়ে যাবে? সে ত খোকা নয় যে আমি তাকে কোলে করে নিয়ে যাব। গোরুর গাড়ী করে পাঠালে সে ত পথেই মরে যাবে। তা ছাড়া কে জানে হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাকে তারা কি করবে? লোকে বলে হাঁসপাতালে গেলে আর সেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না।

পীটার আলেকসায়েফ। প্রেট্রফ-পত্নীর প্রতি। আচ্ছা বোঝা গিয়েছে। থামো। (গ্রামবাসীদের প্রতি) প্রেট্রফের দ্বারা আর কাজ হবার কোন ভরসা নাই। এখন আর একজনকে "স্তারস্তা" নির্ব্বাচিত করতে হবে। তা না হলে পুলিসের লোক এক দিন এসে একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে দেবে। কাকে "স্তারস্তা" করা যায়? এই কথা হতেই অনেকে একটু সরে দাঁড়াল। কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে অন্য লোকের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, যেন তাদের উপর দৃষ্টি না পড়ে। কেউ ইচ্ছা করে "স্তারস্তা" হতে যায় না।

নিকোলাই আইভানিচ। আলেকসাই আইভানফ (Alexai Ivanof) একবারও "স্তারস্তা" হয় নি।

তাকেই এবার-নির্ব্বাচন করা হোক। আলেকসাই আইভানফ আর ব্যারাখের আপত্তি করতে পারলে না। দাড়ি এবং মাথার চুলের বারআনা আন্দাজ সাদা হয় গেলেও, চেহারাটি বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট আছে এবং বিষয়বুদ্ধি-বিশিষ্ট কর্ম্মিষ্ঠ লোক বলেও গ্রামে খ্যাতি আছে। কিন্তু ব্যারাখের আপত্তি না করতে পারলেও তার স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা, মেয়েটিকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাতে হবে, ছেলেটি বিদেশে কাজ করে, বাড়ীতে অন্য কেউ নেই ইত্যাদি অনেক ওজর আপত্তি করলে, কিন্তু সে সকল ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হল না। দশ বার জন লোক একসঙ্গে বলে উঠল অলেকসাই আইভানফকেই "স্তারস্তা" করা হোক। বোঝা গেল গ্রামবাসীদের সকলেরই তাই মত। আলেকসাই আইভানফ এইরূপে "সেলস্কি স্তারস্তা" নির্ব্বাচিত হল। প্রস্তাব করা, সমর্থন করা, অনুমোদন করা, নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হলেই "অর্ডার অর্ডার" বলে চিৎকার করা, ভোট নেওয়া প্রভৃতি পার্লামেণ্টারী আচারের বালাই নেই। যা হল তাই-ই সর্ব্ববাদিসম্মত বলে সকলে গ্রহণ করে নিলে। গ্রামের পুরুষই "সেলস্কিস্খডের" সদস্য, সকলেরই নির্ব্বাচনের হাত আছে। স্ত্রীলোকদের মধ্যেও যাদের স্বামী নেই বা বিদেশে আছে, তাদেরও নির্ব্বাচনের ক্ষমতা আছে। সভার কাজে তারা যোগও দিয়ে থাকে। সভার কাজের প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করবার কোন লিখিত নিয়মাবলী নেই। কখনও কখনও এক সঙ্গে দু, তিন জনে কথা বলে। যে ভাষা সভায় সাধু, তাই যে সর্ব্বদা ব্যবহার করা হয় তাও নয়।

অসাধু ভাষার ব্যবহারও নিতান্ত অল্প নয়। এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও যে কাজ হয় তা খাঁটি, তা কোন দোষে দুষ্ট নয়। "মীরের" সিদ্ধান্ত অলঙ্ঘনীয়। "মীর" মানে আগেই বলা হয়েছে গ্রাম্য সমিতি। "সেলস্কি স্থারস্তা" অর্থে গ্রাম্য সভা আর "সেলস্কি স্থড" মানে গ্রামের মণ্ডল।

মণ্ডল-নির্ব্বাচনের পর গ্রামের জমির বন্দোবস্তের কথা উঠল। রুশিয়ায় গ্রামের জমি "মীরের" সম্পত্তি, কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়। জমিদার নামক কোন পদার্থ নাই। প্রত্যেক গ্রামের দেয় একটা নির্দ্দিষ্ট রাজকর আছে। "মীর"কে সেই কর আদায় করে দিতে হয়। গ্রাম সম্বন্ধীয় অন্য সকল কাজই "মীর" করে থাকে। কোন কাজে রাজপুরুষের হস্তক্ষেপ নেই। জমির রাজস্ব যেমন "মীর" আদায় করে, জমির বিলি বন্দোবস্তও তেমনি "মীর"ই করে। গ্রামের সমস্ত জমি প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—১ বাস্ত, ২ গো-চর, ৩ আবাদী। বাস্ত জমিতে সকলের বাড়ী। পুরুষানুক্রমে সেই বাড়ীতে সকলে বাস করে। কোন রকমে হস্তান্তর করবার কারো অধিকার নাই। পরিবারের লোক সংখ্যা বাড়লে আবশ্যক অনুসারে বাড়ী করতে নতুন জমি দেওয়া হয়। গো-চর জমি ও আবাদী জমি গুণাগুণ ও পরিমাণ হিসাবে গ্রামই সমস্ত পুরুষকে সমান অংশে ভাগ করে দেয় হয়। পুরুষ বলতে সদ্যোজাত শিশু থেকে মুমূর্ষু বৃদ্ধ পর্য্যন্ত পুরুষজাতীয় সকলকেই বোঝায়। "মীর" সকল পুরুষের তালিকা প্রস্তুত করে এবং সেই তালিকা অনুসারে সকলকে সমান অংশে জমি ভাগ করে দেওয়া হয়। ছোট ছোট ছেলেদের ভাগ তাদের অভিভাবকেরা চাষ আবাদ করে। রুশিয়াতে একান্নবর্ত্তী

পরিবার প্রথা আছে। বাড়ীর কর্ত্তার নাম বলস্যাক (bolshak) কর্ত্তা পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র প্রভৃতি লইয়া সংসার করেন। পরিবারের সকল জমিই কর্ত্তা একসঙ্গে চাষ আবাদ করান। চাষে যদি পরিবারস্থ সকল পুরুষের পরিশ্রমের আবশ্যক না হয়, তা হলে আবশ্যকের অতিরিক্ত লোকগুলি সহরে চাকরী করতে যায়। এই রকম নানা স্থানের লোক মিলে সহরে একটা বাড়ী ভাড়া করে। সেই বাড়ীতে একসঙ্গে থেকে, একসঙ্গে খেয়ে এরা একসঙ্গে কাজ করে। এই অস্থায়ী সমিতির নাম আর্টেল (artel)। কাজ শেষ হলে খরচপত্র বাদে তাদের উপার্জ্জিত অর্থের যা বাকী থাকে, তা তারা সমান অংশে ভাগ করে নেয়। এই টাকা কেউ সঙ্গে করে বাড়ীতে এনে কর্ত্তাকে দেয়, কেউ সেইখান থেকেই কর্ত্তাকে পাঠিয়ে দেয়। যারা এই রকম সহরে কাজ করতে যায়, তাদের বধূরা বাড়ীতেই থাকে এবং কৃষির কাজে, ঘর-করণার কাজে সাহায্য করে।

জন্ম মৃত্যু হিসাবে গ্রামের লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হলে সময়ে সময়ে, প্রায়ই পনর বৎসর অন্তর, গ্রামের পুরুষ-তালিকার সংশোধন হয় এবং সংশোধিত তালিকা অনুসারে নতুন করে জমির বিলি বন্দোবস্ত হয়। রুশিয়ার দক্ষিণ প্রদেশের জমি উর্ব্বর। সেখানে কৃষকদের জমি নেবার আগ্রহও খুব বেশী। উত্তর প্রদেশের জমি অনুর্ব্বর, জমি নেবার আগ্রহও লোকের বড় বেশী নয়।

আজ সংশোধিত তালিকা অনুসারে জমির বিলি বন্দোবস্তের দিন। মণ্ডল আইভানকে ডেকে বললেন তুমি কত অংশ জমি নেবে?

আইভান। আমার দুটি ছেলে আর আমি নিজে। আমাকে

তিন অংশই দেন। তবে অনুগ্রহ করে যদি কিছু কম দেন তা হলে বড় ভাল হয়। এখানকার জমির অবস্থা ত জানেন।

বগোলোবফ্। নির্বোধের মত কথা বলো না। তোমার ছেলে দুটি বড় হয়েছে। তারা তোমাকে সাহায্য করে। আবার তারা বিয়ে করলে দুটি বউ তোমার সংসারে আসবে। তারাও সাহায্য করবে।

আইভান। বড় ছেলেটি ত মস্কো-এ থাকে ছোটটিও গ্রীষ্মকালে বাড়ী থেকে চলে যায়।

বগোলোবফ। কিন্তু দুজনেই ত তোমাকে টাকা দেয়। তা ছাড়া বিয়ে হলে ত বউ দুটি বাড়ীতেই থাকবে।

আইভান। ভগবান জানেন কি হবে। তারা বিয়ে করবে কি না তাই বা কেমন করে বলি।

বগোলোবফ। তুমি অনায়াসেই বিয়ের বন্দোবস্ত করতে পার।

আইভান। বন্দোবস্ত ত আমি করতে পারি। কিন্তু কালের গতিটা ত দেখছ। আজ কালকার ছেলেরা কি আর সেকালের মত বাপের কথা শোনে। যদি বা বিয়ে করে ত স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে চায়। আমি তাদের বিয়ের ভরসায় কি কিছু করতে পারি? আমার পক্ষে তিনটা অংশ চালানই গুরুতর ভার।

কার্লিচ। না, না। তোমাকে চারটে অংশ নিতে হবে। তোমার ছেলেরা যদি পৃথক হয়, তোমার কাছ থেকে কিছু জমি নেবে। জান ত ও পাড়ায় ছোট ছোট ছেলে নিয়ে যে কটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আছে, তারা তালিকা অনুসারে অংশ নিতে পারে না।

জনতার মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল "ও (আইভান) বড় মুজিক (mujik) (অর্থাৎ বড় কৃষক) ওর অবস্থা ভাল, ওর উপর পাঁচ জন রাখ, অর্থাৎ ওকে পাঁচ জনের অংশ দাও।

আইভান। দোহাই আপনাদের। আমার উপর পাঁচ জন দেবেন না।

মলল। অচ্ছা তোমাকে চারটে অংশ নিতে হবে (গ্রামবাসীদের প্রতি) কি বল তোমরা?

গ্রামাবাসীরা। চারটে, চারটে।

স্থির হয়ে গেল আইভানকে চারটে অংশ নিতে হবে। তারপর ও পাড়ার যে কটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের কথা বল হয়েছে, তাদের মধ্যে একজনকে—মেরিয়া আইভান্নাকে—ডাকা হল। মেরিয়ার স্বামীটি অক্ষম, তিনটি ছেলে আছে। তার মধ্যে একটি কাজকর্ম্ম করতে পারে। তালিকা অনুসারে তার চার অংশ নেওয়া উচিত। তা সে পারে না।

মণ্ডল। মেরিয়া, তোমাকে তিন অংশ নিতে হবে। তালিকা অনুসারে তোমার ভাগে চার অংশ পড়ে।

মেরিয়া। মীরের বিচারে যা হয়।

মণ্ডল। তা হলে তুমি তিন অংশ নিতে রাজী আছ?

মেরিয়া। রাজী? কি বল বাবা? আমার উপর তিন জন? আমার স্বামী গত গুড্‌ফ্রাইডে থেকে শয্যাগত। সকলে বল্‌ছে অপদেবতার দৃষ্টি পড়েছে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তাকে ত মরার মধ্যে ধরলেই হয়। কেবল একটু আধটু রুটি খেতে পারে। কোন কাজই করতে পারে না।

নিকোলাই। আর সে যে গেল হাটের দিন কাবাকে (Kabak মদের দোকান) গিয়েছিল ?

মেরিয়া। (নিকোলাই-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে) আর তুমি ? প্যারিশের (parish) গত উৎসবের দিন তুমি কি করেছিলে ? মাতাল হয়ে এসে স্ত্রীকে এমন মার মেরেছিলে যে বেচারী চীৎকার করে পাড়াশুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। ছিঃ—

মণ্ডল। ওসব কথা যেতে দাও। তোমাকে আড়াইটা অংশ নিতেই হবে। তুমি যদি নিজে না চালাতে পার, একটা লোক রেখে নিও।

মেরিয়া। তা কেমন করে হবে ? আমি টাকা কোথায় পাব যে লোক রাখব ? আমি গরীব।

কিন্তু সে সব কথা আর আর শোনা হল না। তাকে আড়াই অংশ নিতে হল।

এইরূপে গ্রামবাসী সকলের অংশ স্থির হয়ে গেল। তালিকার তুলনায় যে কম বেশী হল, তা অস্থায়ী। ইচ্ছা করলেই যার যা অংশ তা সে পেতে পারে। বলা বাহুল্য এইরূপে জমীর বন্দোবস্ত নিতে কাউকে সেলামী বা কোন রকম আবয়াব দিতে হয় না। জমির অংশ স্থির হয়ে যাবার পর, সেই অংশে কোন জমিখণ্ড পড়বে, তা নিয়ে আর একবার তর্কবিতর্ক, বাগবিতণ্ডা হয়। পূর্ব্বে যে জমিখণ্ডে সার দিয়ে উর্ব্বর করেছে সে সেই জমিখণ্ডই চায় এবং সম্ভব হলে তাকে তাই দেওয়া হয়। কিন্তু কখনও কখনও এমনও হয় যে সে জমি তাকে দিতে পারা যায় না। তখন তাকে অন্য জমি

নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। জমিতে কৃষকের স্বত্ব এই পর্য্যন্ত যে সে চাষ আবাদ করে ফসল ভোগ করবে, কোন রকমে হস্তান্তরিত করতে পারবে না ১।

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

(১) বৃত্তান্ত গুলি Sir Donald Mackenzie Wallace কৃত Russia হইতে সংকলিত।

আমার খুড়ো

—:*:—

(Maupassant-র ফরাসী হইতে)

বৃদ্ধ, দীর্ঘ-শ্বেত-শ্মশ্রু এক ভিক্ষুক এসে আমাদের কাছে ভিক্ষে চাইল। বন্ধু জোসেফ চাভরাঁশ তার হাতে গুঁজে দিলেন এক'শ সেণ্ট। আমি বিস্মিত হয়ে গেলেম। তিনি বললেন,—

এই ভিক্ষুক একটি পুরাণো ইতিহাস আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যা এ পর্য্যন্ত আমি ভুলতে পারিনি। তোমার কাছে সেইটেই এখন বল্‌তে চাই।

হাভরতে ছিল আমাদের বাড়ী। অবস্থা কোনকালেই স্বচ্ছল ছিল না। টায় টায় চলে যেত। বাবা আফিসে খেটে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতেন, তুই পকেট ভরে টাকা মোটেই আনতেন না। আমার তু'টি বোন ছিল।

পয়সার অনাটনে মা বড় কষ্ট পেতেন, আর প্রায়ই তাঁর স্বামীর জন্য প্রচুর পরিমাণে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ সঞ্চয় করে রাখতেন। গাল খাবার সময় ঐ গরীব বেচারার মুখের দিকে চেয়ে বড় কষ্ট হত, আমার। হাতখানা উঠিয়ে তিনি আপনার কপালের উপর বুলিয়ে যেতেন, যেন ঘাম মুছে ফেলছেন। মুখ থেকে একটি কথাও বেরুত না।

তাঁর এই ব্যর্থ চেষ্টার শোক আমার বুকে বিঁধত।

মিতব্যয়িতা তাঁদের চারদিক দিয়েই ছিল। কোন জায়গায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হ'ত না, পাছে উল্টে কাউকে খাওয়াতে হয়। বাজারের সবচেয়ে সস্তা গুদোমপচা যত মাল আমদানী করা হত। আমার ভগ্নীরা আপনাদের পোষাক নিজ হাতে করে তৈয়েরী করতেন, আধ হাত লেশ কিনতে হলে দিনভোর কমিটি করতেন। সাধারণত আমরা খেতেম চর্ব্বির ঝোল, আর একই মাংস হরেক রকমে পাক। হয় ত এ তু'টিই পুষ্টিকর ও মুখরোচক হত; আমি বোধ হয় অন্য জিনিস পেলেই বেশী খুশী হতেম।

জামার বোতাম হারিয়ে গেলে বা প্যান্টালুনে একটু খোঁচা লাগলে এক একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যেত।

প্রতি রবিবারে সমুদ্রের ধারে জেটিতে মহা সমারোহে বেড়াতে যাওয়াটি কিন্তু ছিল। বাবা রাইডিং কোট, লম্বা হ্যাট ও দস্তানা লাগিয়ে নাবিকদের উৎসববেশে বেরুতেন, মায়ের হাত ধরে। বোনেরা অনেক আগেই প্রস্তুত হয়ে যাবার সময়টির প্রতীক্ষা করতেন কিন্তু শেষ মুহুর্ত্তে তাঁরা বাবার রাইডিং কোটে অদৃশ্য একটা দাগ আবিষ্কার করে ফেলতেন; তখন বেনজাইন-সিক্ত একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে সেটা মুছে ফেলবার তাড়া পড়ে যেত।

যতক্ষণ কোটটির উপর কারিগরি হ'ত বাবা খালি সার্ট গায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার টুপীটিকে সামলাতেন, আর মা নষ্ট হবার ভয়ে দস্তানা খুলে ফেলে, চশমা এঁটে হাত চালিয়ে যেতেন।

বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে পথ চলা হত। বোনেরা যেতেন আগে, হাতে হাত দিয়ে। তাঁদের বিয়ে হয় নি পথে ঘাটে বের হওয়া রীতিমত দরকার ছিল। আমি চলতেম মায়ের বাঁয়ে, বাবা

ডান দিক আগলাতেন। প্রতি রবিবারের এই বেড়ানোর সময়টিতে আমার দরিদ্র পিতামাতার জাঁদরেলি হাবভাব, গম্ভীর মুখ ও সগর্ব্ব চলার কায়দা এখনও আমার দিব্য মনে পড়ে। ধড় সিধে রেখে, ঠ্যাং টান করে গম্ভীর চালে তাঁরা চলতেন—যেন একটু এদিক ওদিক হলেই অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রতি রবিবারেই দূর দূরান্তের অজানা দেশ থেকে আগত সব বড় বড় জাহাজকে ঘাটে ভিড়তে দেখে বাবা অভ্যাস মত বলতেন, "দেখ, জুলস যদি ওদের কারও ভিতরে এসে থাকে তাহলে কি অবাকই না আমাদের করে দেবে!"

বাবার সহোদর ভাই, আমার খুড়ো জুলস প্রথমে ছিলেন কুলের অঙ্গার, এখন হয়েছেন আশাবর্ত্তিকা। ছেলেবেলা থেকে ঐ খুড়োর কথা শুনে আসছি, আর এত শুনেছি যে আমার মনে হয় দরজায় তাঁর প্রথম করাঘাতে—তাঁকে চিনে ফেলতেম। আমেরিকা যাত্রার দিন পর্য্যন্ত তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনা আমি ভাল করেই জানতেম, কারণ ঐ সময়ের কথা উঠলেই বাড়ীর সকলের গলার স্বর খাদে গিয়ে নামত। সকলে বলাবলি করত যে চরিত্রটা তাঁর খারাপ ছিল, অর্থাৎ তিনি কিছু টাকা উড়িয়ে ছিলেন; দরিদ্রের সংসারে এইটেই সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ। টাকাওয়ালা লোক আমোদ আহ্লাদে কিছু ব্যয় করলে, সকলে বলে লোকটি বয়ে গেছে। পাড়া প্রতিবাসীরা একটু মুচকি হেসে বলে, লোকটি স্ফুর্ত্তিবাজ হে। আর গরীবের ঘরে যে ছেলের জন্য বাপমাকে মূলধনে হাত দিতে হয় সে হচ্ছে লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা, বোম্বেটে।

মনে হয় বিচারের এই বিচিত্র পদ্ধতিটা ঠিকই বা হবে; কারণ অপরাধের দর এক হলেও ফলভেদে তার গুরুত্ব বেড়ে যায়।

এই রকমে নিজের পথে চলতে চলতে আমার খুল্লতাত মহাশয় পৈতৃক সম্পত্তির নিজ অংশটুকু নিঃশেষে হজম করে ফেলে বাবার অংশ টুকুও খোয়াবার যোগাড় করলেন।

তখন তাঁকে ধরে হাবরে থেকে নিউইয়র্কগামী এক সদাগরী জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে সবাই নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

আমেরিকা নেমে খুড়োমশাই কি একটা ব্যবসা ফেঁদে বসলেন, বাড়ীতে লিখে পাঠালেন যে তিনি কিছু কিছু পাচ্ছেন এবং আশা করেন তাঁর ভ্রাতার যে টাকা খেয়েছেন শীঘ্রই সেটা শোধ দিতে সক্ষম হবেন। ঐ চিঠি পেয়ে বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। যে জুলসকে বেচলে একটা কুকুরের গলার শিকলির মূল্যও জুটত না হঠাৎ সে হয়ে দাঁড়াল একজন উঁচু দরের সাধু, হৃদয়বান পুরুষ, ডাবরাঁশ কুলের উপযুক্ত বংশধর।

তারপর এক জাহাজের কাপ্তেন মারফৎ আমরা খবর পেলেম খুড়ো একখানি বড় দোকান খুলেছেন এবং খুব ভারী রকমের ব্যবসা চালাচ্ছেন।

এর দু'বছর পরে দ্বিতীয় পত্র এল, "প্রিয় ফিলিপ, আমার শরীর কেমন আছে না জানতে পেরে তুমি ব্যস্ত হয়ে পড় এজন্য লিখছি যে আমি খুব ভাল আছি। কাজও খুব ভাল চলছে। আগামী সপ্তাহে আমি দক্ষিণ আমেরিকায় একটা দূরের পথে যাত্রা করছি। অনেক বছর হয়ত তোমাকে কোন খবরই দিতে পারবনা। আমার চিঠি না পেলে ব্যস্ত হয়ো না। হাতে টাকা হলেই হাবরে ফিরব। আশা

করতে পারি সে দিন শীঘ্রই আসবে। তখন কত সুখ স্বচ্ছন্দে আমরা থাকতে পারব।”

সেই থেকে ঐ চিঠি খানার কথা গুলো হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের বাড়ীর সবাইকার জপমন্ত্র। যখন তখন সেটা পড়া হত; দুনিয়ার লোককে সেটা দেখানো হত।

এরপর দশবছরের মধ্যে খুড়োর আর কোন খবর বার্ত্তাই পাওয়া গেল না। কিন্তু আমার বাবার আশা যতই দিন যেতে লাগল ততই বেড়ে চলল। মা মাঝে মাঝে বলতেন,—“জুলস এখানে এলেই আমাদের অবস্থা বদলে যাবে। কি মুক্তির নিশ্বাস তখন ফেলতে পারব!”

প্রতি রবিবারেই সমুদ্রের মাঝে বহুদূরে ঘন কাল ধোঁয়ার রাশ সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠতে দেখে, বাবা তাঁর সেই পুরাণো বাঁধা গৎ আওড়াতেন,—“দেখ জুলস যদি ওদের কারও ভিতরে এসে থাকে তাহলে কি অবাকই না আমাদের করে দেবে!”

তখন তাঁদের ভাব দেখে মনে হ’ত এখনই বুঝি খুড়ো জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে রুমাল নেড়ে ডাকবে “কিলিপ”।

খুড়ো এলে কি করা হবে সে সম্বন্ধে হাজার রকম প্ল্যান তাঁদের মাথায় খেলত। সকলেরই ইচ্ছে ছিল যে খুড়োর টাকা দিয়ে পড়াগাঁয়ে ছোট একটি বাড়ী কেনা হয়। আমি জানতেম ইতিমধ্যেই বাবা দু’একজনের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথাও পেড়েছিলেন।

আমার বড় বোনের বয়েশ হয়েছিল আটাশ, অপরটির ছাবিবশ। তখনও কারও বিয়ে হয় নি; দেশে সকলেই—এই নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করত।

শেষ কালে ছোটটির পাণিপ্রার্থী হয়ে একজন দেখা দিলেন।

তিনি ছিলেন কেরানী সচ্চরিত্র, দরিদ্র।

আমার ধারণা যে খুড়োর ঐ চিঠিখানা একরাত্রে চোখে পড়েছিল বলেই—আমার বোনের পাণিপ্রার্থী যুবকটি অত তাড়াতাড়ি আমাদের আত্মীয় হয়ে যান।

বাপ মা ঐ ভদ্রলোকের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। ঠিক হল যে বিয়ের পরে সবাই মিলে জারসিতে একবার বেড়িয়ে আসা হবে।

যাদের টাকা পয়সা নেই—তাদের সমুদ্র ভ্রমণ করতে হলে জারসির মত জায়গা আর নেই। খুব দূরে যেতে হয় না, ছোট ডাকের জাহাজ চ’ড়ে সমুদ্র একটু পাড়ি দিলেই ইংরেজ অধিকৃত এই “বিদেশ” দেখা যায়। সেখানে প্রতিবাসী একটা ভিন্নজাতকে তাদের ঘরকন্নার মধ্যে দেখবার সুযোগ, দু’ঘণ্টার সমুদ্র যাত্রাতেই একজন ফ্রেঞ্চম্যানের ভাগ্যে ঘটে যায়; অধিকন্তু ব্রিটিশ পতাকা-রক্ষিত এই দ্বীপবাসীদের জঘন্য আচার ব্যবহার (স্পষ্টবাদীদের মতে) স্বচক্ষে দেখবার সুবিধে হয়।

এই জারসি যাত্রা আমাদের জপের মালা হয়ে দাঁড়াল, সর্ব্বক্ষণ এক চিন্তা, এক স্বপ্ন।

অবশেষে সত্যই একদিন আমাদের নিয়ে জাহাজ ছাড়ল; এখনও আমার মনে হচ্ছে সে যেন কালকের কথা। শোঁ শোঁ করে ষ্টীম এসে গ্রাঁভিলের জেটির গায়ে লাগছে; নূতন জহাজে চড়ে ভয় খেয়ে বাবা আমাদের তিনটি মাল ওঠানো দেখছেন; মুরগীর পাল থেকে সবগুলো চ’লে গিয়ে মাত্র একটি থাকলে সেটি যেমন

কারও নজরে পড়ে না, ছোট বোনের বিয়ে হবার পর আমার বড়টিরও ঠিক সেই অবস্থা ; মা ব্যস্ত হয়ে তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ; আর আমাদের নব বিবাহিত দম্পতীযুগল তাঁদের অভ্যাস মত দাঁড়িয়ে ছিলেন সকলের পেছুতে, সেহেতু আমাকেও বারে বারে ঘাড় ফেরাতে হচ্ছিল তাঁদের উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য।

জাহাজের বাঁশী বেজে উঠল। আমরা উঠে পড়তেই জেটি ছেড়ে দিয়ে, সবুজ মার্ব্বেল পাথরের তৈয়েরী একখানা টেবিলের মত সমতল সমুদ্রের উপর জাহাজখানি গা ভাসিয়ে দিল। লুপ্তপ্রায় তট-রেখার দিকে চেয়ে আমরা দাঁড়িয়ে রইলেম পরম উল্লসিত ও গর্ব্বিত ভাবে, কারণ এই আমাদের প্রথম সমুদ্র যাত্রা।

বাবা বুকটান করে দাঁড়ালেন, গায়ে সেই পরিচিত রাইডিং কোট। সেদিন সকালে বেনজাইন দিয়ে সেটা সাফ করা হয়েছিল, তার গন্ধ এখন বাতাসের মুখে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে বিশেষ করে রবিবারের বেড়ানোর সময়টির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল দুইটি ভদ্রলোক দু'জন ভদ্রমহিলাকে "অয়েস্টার" দিচ্ছেন। এক বুড়ো, ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা জহাজের মাল্লা, ছুরি দিয়ে শামুকের মুখ কেটে সে গুলো ভদ্রলোক দু'টির হাতে দিলে তাঁরা সেগুলো মহিলাদের নিকট চালান করলেন। মহিলারা একখানা পাতলা রুমালের উপর সেগুলো রেখে,পোষাক না নষ্ট হয় এজন্য মুখ বাড়িয়ে অতি মধুর ভঙ্গীতে সেগুলি গলাধঃ-করণ করলেন। শেষে টুক করে জলটুকু খেয়ে খোলাগুলো সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন।

চলতি জাহাজে চড়ে অয়েস্টার খাওয়া এক রকমের নবাবী। এ

ঠিক কথা যে বাবারও দেখাদেখি সখ গেল। তিনি দেখলেন যে এটি বিশিষ্ট ও উচ্চ ষ্টাইলের সৌখীনতার পরিচায়ক। যেখানে মা ও বোনেরা ছিলেন সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তোমাদের অয়েস্টার খাবার ইচ্ছে আছে"?

মা খরচের কথা ভেবে ইতস্তত করলেন ; কিন্তু বোনরা তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মা ভেবে বললেন, "ওগুলো আমার সহ্য হয় না। ছেলেদের কিছু দাও কিন্তু বেশী খেলে অসুখ করবে।" আমার দিকে ফিরে বললেন, "জোসেফকে দিয়ে কাজ নেই। ছোট ছেলেদের ওতে নিশ্চয় অসুখ করে।"

মার অবিচার দেখে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেম, বাবা গম্ভীর চালে তাঁর দুই মেয়ে ও জামাইকে বুড়ো মাল্লার কাছে নিয়ে চললেন।

মহিলা দু'জন ইতিমধ্যে অন্যত্র গিয়েছিলেন। বাবা বোনদের বোঝাতে লাগলেন কি করে জল না ফেলে অয়েস্টার খেতে হয় ; ভাল করে দেখাবার জন্য তিনি একটা শামুক হাতে নিলেন। মহিলাদের অনুকরণ করতে গিয়ে তখনই সবখানি তরল পদার্থ তাঁর রাইডিং কোটের উপর ঢেলে ফেললেন। মা অনুচ্চ স্বরে বললেন, "অত হেকমত না দেখালেই ভাল হ'ত।"

হঠাৎ বাবা যেন অস্থির হয়ে পড়লেন। আমার বোনেরা তখনও ঐ শামুক ওয়ালাদের কাছে দাঁড়িয়ে ; তিনি একটু দূরে গিয়ে তাদের দিকে স্থির নেত্রে দেখতে লাগলেন এবং খামকা আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখের চেহারা তখন রক্তশূন্য, চোখ চঞ্চল। তিনি নিম্নস্বরে মাকে বললেন, "ঐ যে লোকটি শামুকের মুখ কাটছে, জুলসের চেহারার সঙ্গে ওর আশ্চর্য্য মিল দেখছি"।

মা বললেন, "কোন জুলস" ? বাবা জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "তাইত দেখ—আমার ভাই জুলেস—আমেরিকায় ভাল অবস্থায় সে আছে না জানলে আমি ভাবতেম ঐ লোকটিই জুলস"।

মা চমকে উঠে বললেন, "পাগল হয়েছ! জান যখন জুলেস ও নয়, তখন কেন এমন যা তা বকছ ?" বাবা তবুও বললেন, "আচ্ছা এগিয়ে দেখ ; নিজের চোখে দেখে ঠিক করাই ভাল"।

মা উঠে ভগ্নীদের কাছে গেলেন। আমি লোকটার দিকে চাইলেম—দেখতে সে বুড়ো, নোংরা, শুকনো কাঠ বিশেষ ; এক মনে নিজের কাজ করছিল।

মা ফিরলেন, দেখলেম তিনি কাঁপছেন। দ্রুতস্বরে বললেন,—"আমার মনে হয় এ সেই। কাপ্তেনের কাছে কিছু খবর পাও কি না জেনে এস। দেখ খুব সাবধান, শেষে এই হতভাগাটা আবার আমাদের ঘাড়ে না চাপে"।

বাবা কাপ্তেনের খোঁজে চললেন, আমিও পিছু নিলেম। আমার মনের অবস্থা তখন কেমন যেন হয়ে গিয়েছে।

ঢ্যাঙ্গা, শুকনো, লম্বা গোঁফে শোভায়মান কাপ্তেন সাহেব অতি গম্ভীরভাবে তাঁর ঘরের সুমুখে পায়চারি করছিলেন, দেখে মনে হয় যেন তিনি আটলাণ্টিক মহাসাগরের ওপার থেকে জাহাজ চালিয়ে আসছেন।

বাবা সসম্ভ্রমে তাঁর নিকটস্থ হয়ে, দু'একটি প্রশংসা বাক্যের পর তাঁর সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন,—"জারসির বিশেষত্ব কি ? সেখানে কোন কোন ফসল জন্মে ? লোকসংখ্যা কত ? আচার

ব্যবহার কিরূপ ? পোষাক পরিচ্ছদ কিরূপ ? মাটির উর্ব্বরতা কিরূপ" ? ইত্যাদি।

কথাবার্ত্তার ধরণ দেখে লোকে ভাবত এরা অন্তত আমেরিকা সম্বন্ধে কথা কইছে।

এর পর "এক্সপ্রেস" অর্থাৎ যে জাহাজ আমাদের নিয়ে চলছিল তার সম্বন্ধে আলাপ হল ; তারপর জাহাজের সাজসজ্জা ও শেষে বাবা একটু কেশে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার জাহাজে একটি বুড়ো অয়েষ্টার ওয়ালা আছে যাকে দেখে মনে হয় তার কিছু পূর্ব্ব ইতিহাস আছে। তার সম্বন্ধে অপনি কিছু জানেন কি ?"

আলোচ্য বিষয়ের এই অধোগতিতে কাপ্তেন সাহেব চটে গিয়েছিলেন। তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন—

"ঐ বুড়ো ফরাসী হতভাগাটাকে গেল বছর আমি আমেরিকায় কুড়িয়ে পাই ও সঙ্গে করে দেশে ফিরিয়ে আনি। হাবরেতে বোধহয় ওর কোন আত্মীয় আছে, কিন্তু তাদের কাছে টাকা ধারে বলে ফিরে যেতে চায় না। ওর নাম জুলস—জুলেস ডামরাঁশ কি ডাবরাঁশ ঐ রকম কিছু হবে। আমেরিকায় একসময়ে ও টাকাওয়ালা লোক ছিল, ওর বর্ত্তমান অবস্থা ত স্বচক্ষে দেখছেন"।

বাবার মুখের চেহারা পাঁশুটে হয়ে গিছল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে স্খলিতকণ্ঠে তিনি বললেন,

"আহা—হা—বেশ, ঠিক হয়েছে,—আমি মোটেই—আশ্চর্য্য হই নি। আপনাকে বহু ধন্যবাদ কাপ্তেন সাহেব"।

তিনি চলে গেলেন। কাপ্তেন অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

তিনি মার কাছে এলেন। তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত দেখে মা বললেন, "একটু ব'স, ওরা কিছু টের পেয়ে যাবে"।

বেঞ্চের উপর বসে পড়ে অস্থিরভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে বাবা বলে উঠলেন, "এ সেই, ওগো এ সেই"

একটু থেমে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করা হবে এখন ?"

মা তৎক্ষণাত জবাব দিলেন, "মেয়েদেয় সরিয়ে দে'য়া দরকার। জোসেফ সব জানে, সেই ওদের খুঁজতে যাক্। বিশেষ সাবধানে থাকতে হবে যাতে জামাই কিছু না জানতে পারে।"

বাবা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন,—"কি দুর্ঘটনা!

শুনে মা একমুহূর্ত্তে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, হুঙ্কার দিয়ে বললেন,

"দুর্ঘটনা না হাতী! মন আমার অষ্ট প্রহরই টিক টিক করেচে ও লক্ষীছাড়ার কিছু হবে না, ও শেষে আমাদের ঘাড়েই ফের চাপবে! ডাবরাঁশ গুষ্টির চৌদ্দপুরুষে কেউ কখন কিছু করতে পেরেছে? বচন শুনে বাঁচি নে!"

বাবা কপালের উপর হাতখানা বুলিয়ে গেলেন। স্ত্রীর বকুনির ধাক্কা সামলাবার এইটি তাঁর একমাত্র অস্ত্র।

মা ফের বল্লেন, "ওর পাওনাটা জোসেফের হাতে দেও ; সে গিয়ে দিয়ে আসুক। শেষে ভিখিরীটা আমাদের চিনে ফেলুক—না, না তার আর দরকার নেই। জাহাজের সকলে কি মজাই দেখবে এখন! আমরা ঐ ধারে যাই, দেখ লোকটা যেন কাছে এসে না পড়ে,"

এই বলে তিনি উঠলেন। আমার হাতে একশ "সুর্" এক গোটামুর্দ্রা দিয়ে তাঁরা জাহাজের অন্য দিকে চলে গেলেন।

বোনেরা বিস্মিত হয়ে বাবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বললেম সমুদ্রের দুলুনীতে মা কিছু অসুস্থ হয়েছেন।

অয়েষ্টার ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেম, "আপনার কত পাওনা হয়েছে মহাশয় ?" আমার বলতে ইচ্ছা হল—"খুড়ো মহাশয়"।

"দুই ফ্রাঙ্ক"

আমি একশ সেণ্ট—তাঁকে দিলেম, তিনি বাকী পয়সা ফিরিয়ে দিলেন।

আমার চোখ ছিল তাঁর হাত খানার উপর—জাহাজের খালাসীর সেই-রগ-তোলা, কাটা হাত, আর জরাখিন্ন, দুঃখ ক্লিষ্ট সেই মুখের উপর। মনে মনে তখন বলছি—"এই আমার খুড়ো, এই আমার বাপের ভাই।"

আমি দশ সেণ্ট বকশিশ দিলেম। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিলেন—"বাবা ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ"—ঠিক একজন ভিখিরীকে ভিক্ষে দিলে সে যেমন করে বলে থাকে। আমার মনে হ'ল তিনি নিশ্চয় এর আগে ভিক্ষে করেছেন।

আমার দানের পরিমাণ দেখে, বোনেরা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

বাকী পয়সা যখন মাকে ফিরিয়ে দিলেম তিনি বললেন, "এত লেগেছে ? ডাকাত নাকি ?"

আমি বললেম "দশ সেণ্ট তাকে জল খেতে দিয়েছি।"

মা লাফিয়ে উঠে, চোখ গরম করে চীৎকার করে উঠলেন, "পাগল হয়েছে এ ছোঁড়া! দশ সেণ্ট দান—ঐ হতভাগাটাকে"—

বাবা জামায়ের দিকে ইসারা করলেন। মা ঐ দেখে হঠাৎ ক্রোধ সম্বরণ করলেন।

তারপর সব চুপ।

আমাদের সুমুখে ধুসর ছায়া, মনে হয় যেন সমুদ্রের জল থেকে ঠেলে উঠছে।

ঐ জারসি।

জেটির কাছে জাহাজ ভিড়লে, আমার খুব ইচ্ছে হল যে আমার খুড়ো জুলেসকে আর একবারটি দেখি, তাঁর কাছে গিয়ে একটা সান্তনা বাক্য, একটু স্নেহমাখা কথা বলি।

কিন্তু সকলের অয়েষ্টার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তিনি অন্তর্হিত হয়েছিলেন, সম্ভবত জাহাজের খোলের মধ্যে যে অন্ধকার ময়লা খোপটায় এই হতভাগ্য থাকত সেখানেই সকলের চোখ এড়িয়ে নেমে গিয়েছিল।

আমরা ফেরবার পথে "সেঁৎমালোয়" অন্য একটা জাহাজে চড়লেম, যাতে করে খুড়োর সাথে আর দেখা না হয়। মা দুর্ভবনায় অস্থির হয়ে কঠেছিলেন।

এর পর আমার বাপের ভাইকে আর কখন চোখে দেখিনি।

এইত্নিহচ্ছে আমার ভিখিরীদের মাঝে মাঝে একশ সেণ্ট দেবার ইতিহাস।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী।

কুজ্যাঁর ভবিষ্যত

(George Duhamel-এর Civilisation হইতে অনুবাদ)

[ধর্ম্ম, রাষ্ট্র বা সমাজ নিয়ে যখন সমস্ত দেশের চিত্ত সত্য সত্যই মথিত হয়ে ওঠে তখন সে মন্থন সাহিত্যে প্রকাশ ত পায়ই, অনেক সময়ে নবযুগ এনে থাকে। রেণেস াঁশ, ফরাসীবিপ্লব প্রভৃতি যে সকল বিরাট ঘটনা ইউরোপে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল তাদের উৎপত্তি ছিল জনসাধারণের চিত্তে। গত মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় সাহিত্যে যে কোন নূতন সৃষ্টির আভাষ আমরা এখনও পাই নি, আমার মনে হয় তার কারণ এ যুদ্ধের উৎপত্তি হয়েছিল মন্ত্রীসভার দপ্তর খানায়, এর পিছনে কোন thought movement ছিল না। অবশ্য পরে খবরের কাগজের সাহায্যে দেশের প্রাণে হিংসার আগুন জালিয়ে তোলা হয়েছিল। যুদ্ধের পুর্ব্বে যাই হোক যুদ্ধান্তে ইউরোপের মনে যে বিপুল মন্থন চলছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ মন্থনে কোন বড় সাহিত্য সৃষ্টি হবে কি না তা বিবেচনা করবার সময় এখনও আসে নাই। সে যাই হোক যুদ্ধের পরে যে সব লেখক ইউরোপে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন ফরাসী লেখক Duhamel তার মধ্যে একজন। তিনি যুদ্ধের পূর্ব্বেই ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, যুদ্ধের পরে ইউরোপীয় সাহিত্যের আসরে আসন লাভ করেছেন। গত চার পাঁচ বছরের মধ্যে Duhamel এর Civilisation ফ্রান্সের মনকে যেরূপ নাড়া দিয়েছে এক Barbusse এর Le Feu ছাড়া এমন কোন বই-ই লেখা হয় নাই যা সেরূপ দিতে পেরেছে।

Civilisation যুদ্ধের কতগুলো ছবির সমষ্টি। সেগুলি যেমন জীবন্ত তেমনি ট্র্যাজিক। বীরের মৃত্যু ট্র্যাজেডি নয়—কারণ মৃত্যু তাদের জীবনকে

পূর্ণতা দেয়, মৃত্যু তাদের পক্ষে গৌরবান্বিত পরিণতি। কিন্তু যারা বীর নয় অসাধারণ কিছুও নয়—যারা যুদ্ধে মরবার কথা জীবনে কখন মনেও আনে নাই—তারা যখন অন্যের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে অবোধের মত প্রাণ হারায়—তার চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কিছু নাই। তাদের সে অখ্যাত অজ্ঞাত মৃত্যুতে কোনই বিশেষত্ব নাই, বীরত্ব হয় ত আছে—কিন্তু সে সম্বন্ধে তারা নিজেরাও সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা উদাসীন। খবরের কাগজের পাতায়ও তাদের অবহেলা করা হয়—তাদের মত দশহাজার লোক মরলে তবে লেখা হয়—'অমুক আক্রমণে মাত্র দশহাজার সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে।' এই সব লোক কেউ বা ঘড়ির দোকান করে, কেউ বা ক্ষেত চষে জীবন কাটাত—দু'চার টাকা জমিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে তাদের দিন যাচ্ছিল। এর মাঝখানে এল লড়াই। State বলে একটা মানুষের হাতগড়া নিরেট নির্ম্মম দৈত্য প্রত্যহের কাজের মাঝখানথেকে তাদের ছোঁ মেরে নিয়ে গেল—তারপর তাদের পোষাক পরিয়ে, ড্রিল করিয়ে, গায়ে নম্বরের টিকিট ঝুলিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল। সেখানে তাদের কারো বা প্রাণ গেল কেউ বা হাত, পা, চোখ হারিয়ে হাঁসপাতালে ফিরে এল। Duhamel ব্যবসায়ে ডাক্তার ছিলেন—এবং ডাক্তার হয়েই তিনি যুদ্ধে যান—তাই তাঁর লেখায় এই হাঁসপাতালের কথাই আমরা পাই। পাঠকেরা দেখবেন এই সব আহতব্যক্তিরা যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন কথাই বলে নি, কারণ আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা তাদের কাছে হেঁয়ালী বলে মনে হয়েছে। বলির পশু যেমন বলির পূর্ব্বে নীরব হয়ে যায়—এরাও তেমনি নীরবে মরেছে—যদি বা কেউ তখন কোন কথা বলে থাকে তবে সংবাদপত্রের জয়ঢাকে যে হিংস্র উন্মত্ত বাজনা বেজেছিল—তাতে সে কথা দোশর কানে পৌঁছয় নি। আজ যুদ্ধের শেষে যাঁরা সেই সব মুক, অখ্যাত লোকদের মুখে ভাষা দিয়েছেন—Duhamel তাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লেখক।]

আমি যখন একটু সময় পেতুম কুজ্যাঁর বিছানায় তার পায়ের দিকটায় গিয়ে বসতুম। সে বল্ল—"ছাখো আমার পা'টা কেটে ফেলায় তোমার বসবার অনেকটা জায়গা হয়েছে। ওরা সেই জন্যেই পা'টা কেটেছে—কেমন হে"?

চল্লিশ বছর বয়েসেও এই লোকটির মুখ ছিল তরুণ ও কোমল। তার মুখে একটা সরল হাসি সব সময়েই লেগে থাকত। "ক্ষেউরীর দিনে" কামালো হয়ে যাবার পর তার সেই হাসি দেখলে আমাদের মনটাও ভাল থাকত। তার সেই হাসি ছিল ভারি আশ্চর্য্য—খুব মৃদু হাসি—তাতে ছিল খানিকটা বিদ্রূপ—খানিকটা সরলতা, ঠিক ফ্রান্সের হাসির মত। যে ঠোঁটের উপর হাসিটা খেলত সে ঠোঁট ছিল রক্ত-হীনতায় বিবর্ণ এবং তার মুখও ছিল প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে শীর্ণ। এ সমস্ত সত্বেও কুজ্যাঁর চেহারায় একটা প্রীতির ভাব ছিল—যেন পৃথিবীতে সবাইকে সে বিশ্বাস করত। বিশেষতঃ তার নিজের উপর তার অগাধ আস্থা ছিল—তার প্রথম কারণ সে বেঁচে ছিল এবং দ্বিতীয় কারণ—সে ছিল কুজ্যাঁ।

তখনও তার একটা পা বাকী ছিল, তবে সত্যি কথা বলতে কি—সে পা'খানারও মূল্য খুব বেশী ছিল না। একটা টর্পিডো ফেটে তার হাঁটুটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার কেস্ খুবই খারাপ ছিল—সে সম্বন্ধে কোন কথা বলতে হলে সবাই ফিস্ ফিস্ করে কথা বলত আর মাথা নাড়ত।

কিন্তু তাতে কি হয়? কুজ্যাঁর পায়ের উপর যে তার খুব নির্ভর ছিল তা নয়। এর আগেই তার অন্য পা'টা সে হারিয়েছিল। একটা পা বেশী কমে তার বিশেষ কিছু এসে যেত এমন মনে হয়

না। আমার মনে হয় কুজ্যাঁ তার বুক, মাথা বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর বেশী নির্ভর করত। পা থাক বা না থাক সে আগেও যেমন ছিল তেমনি রইল। এবং তার উজ্জ্বল সবুজ রঙের চোখে যে স্নিগ্ধ আলোটি জ্বলত সেটি যেন ছিল তার সরল মনের প্রতিমূর্ত্তি মত।

আমি তার বিছানার উপর গিয়ে বসতুম আর কুজ্যাঁ তার জীবনের ইতিহাস আমায় বলে যেত। এই যুদ্ধ হঠাৎ এসে যেখানে তার জীবনসূত্রকে ছিন্ন করে দিয়েছিল সে সেইখান থেকেই আরম্ভ করত, এবং স্বভাবতঃই যুদ্ধের পূর্ব্বে শান্তির সময়ে তার জীবনে যেমন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল যুদ্ধান্তে ভবিষ্যৎ জীবনেরও সে সেইরূপ সুখকল্পনা করে নিত। অশান্তিপূর্ণ রক্তাক্ত অতল গহ্বরটার ওপার থেকে অতীত জীবনের সূত্রটাকে টেনে এনে ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে তার ভালই লাগত। কখনও তার মুখে অতীত বাচক ক্রিয়াপদ শুনি নি—সব সময়ই বর্ত্তমান—আশ্চর্য্য চিরস্থায়ী বর্ত্তমান। সে বলত—"আমার ছিল শিল্পদ্রব্যের ব্যবসা। ব্যবসা জানলে ওতে বেশ লাভ থাকে। আমার কাজ ছিল বেশীর ভাগ এই ঝাড়, বাতিদান নিয়ে। কোহেন কোম্পানি, মার্গু ইলে,, স্মিথসান, আর আর বড় বড় হৌসের সঙ্গে আমার কারবার ছিল। আমার কাজের একটা বিশেষ রকম ছিল এই যে—খদ্দেরকে আমি হাতে রাখতুম। সে যে কি চায় তাকে তা'ভাল করে বুঝিয়ে তবে তাকে জিনিস বিক্রী করতুম।

"মনে কর বার্ণাবে সাহেব বা অমনি একটা কেউ তার বৈঠক খানার জন্যে একটা ঝাড় কিনবে বলে আমার কাছে এল। আমি বল্লুম 'বেশ। আপনি কি চাচ্ছেন আমি বুঝেছি'; অমনি ঝাঁ করে একটা ট্যাক্সি করে বেরোলুম। গেলুম কোহেন কোম্পানীর কাছে বল্লুম—'পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিশন আমার ঠিক ত'—ধর কোহেন গররাজী। বেশ, এলুম নেমে, আবার ট্যাক্সিতে উঠলুম—স্মিথসানের ওখানে গেলুম•••••অবশ্য এতে খরচ আছে। শেষকালে যদি বার্ণাবে পিছিয়ে যায়—তা হলে ট্যাক্সিভাড়া অবশ্য আমাকেই দিতে হবে······কিন্তু এতে মজা আছে······এ ব্যবসায় এক রকম করে পুষিয়ে যায়—বুঝেছ; আসল কথা কি জান পছন্দ থাকা চাই"

কুজ্যাঁর উৎসাহদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে আমি হাসতুম। তার গাল দুটো ঝুটো মার্ব্বেলের মত—দেখতে ভাল নয়। জ্বর হয়ে অনেক দিন যারা বিছানায় পড়ে থাকে, অথবা যাদের হজম হয় না তাদের চোখের মত কুজ্যাঁর চোখ দুটোও ফোলা ফোলা দেখাত। চল্লিস বছর বয়েসে মনটা যতই তরুণ থাকনা কেন, শরীরটা টর্পিডোর আঘাত থেকে কুড়ি বছর বয়েসে যতটা চটপট সেরে উঠতে পারে চল্লিশে ততটা পারে না। আমি সেই পদশূন্য কুজ্যাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম আর সে বলে যেত কেমন করে তার ব্যবসার জন্যে সে একবার কোহেনের দোতলার আফিসে ছুটে উঠত, একবার স্মিথসানের সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে আসত, একবার মার্গু ইলের ওখানে গিয়ে লাফালাফি করত।

একদিন কুজ্যাঁর পা দিয়ে রক্ত পড়ল। লাল ঘামের মত, কফিপাতার উপর ভোরবেলাকার শিশিরের মত বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত তার ব্যাণ্ডেজের ভিতর থেকে চুঁইয়ে বের হতে লাগল। চার পাঁচ দিন প্রত্যহ কুজ্যাঁর ঘা থেকে রক্ত পড়ল। প্রত্যেক

বার তাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেওয়া হত। নানা রকম ওষুধ দেওয়া হত—তাতে রক্তও বন্ধ হত। প্রত্যেকবার কুজ্যাঁ একটু বেশী ফ্যাকাশে হয়ে তার বিছানায় ফিরে আসত। তাকে নিয়ে যাবার সময়ে সে আমাকে বল্ল—"দেখেছ হে—কিছুতে শান্তি নেই"

একদিন সকালবেলা আমি কুজ্যাঁর কাছে গিয়ে বসেছি—সে মুখহাত ধুচ্ছে। সে হাঁফিয়ে উঠছিল। তার মুখের সেই ফোলা ফোলা ভাব সত্বেও আমি দেখলুম তার মুখটা বেজায় ঝরে গেছে আর তার কোন আকার নেই। যেন কোন প্রছন্ন রোগ ভিতরে ভিতরে তাকে গ্রাস করে ফেলছিল। সত্যি তার মুখটা দেখলে মনে হত যেন একটা পোকাপড়া পচা ফল!

সে বল্ল—"ভাল খবর এসেছে হে—আমার ছেলেদের খবর,—তাদের একজনের বয়স বার একজনের তেরো। তাদের বেশ হচ্ছে। কেমন—তোমায় বলি নি? আমি ভাবছি এবার ঝাড়ের সঙ্গে ঘড়ি-টড়ির ব্যবসাও জুড়ে দেব। আমি যে সব লোককে জানি তাতে একটা বড় রকমের কিছু করবার ইচ্ছা আছে। উদ্দেশ্য টা সব সময়েই খুব বড় রাখতে হয়—বুঝেছ? উঃ...শীগগির শীগগির আরম্ভ করতে হবে......হয়ে যাবে......কি দরকার জান—এই ষ্টাইলটা জানা চাই............

আমি হাসবার চেষ্টা করলুম কিন্তু বুকটা কে যেন চেপে ধরল। কুজ্যাঁর মনটা অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। সে এক হাতে তোয়ালে খানা আর এক হাতে সাবানটা ঘোরাতে লাগল। সে তার ভাবী জীবনের গৌরব এমনিভাবে বর্ণনা করতে লাগল যেন সে দেখতে পাচ্ছিল বিছানার চাদরের শাদা জমীর উপর বড় বড় অক্ষরে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লেখা রয়েছে।

বিছানার চাদরের দিকে তাকালুম। হঠাৎ দেখি সেখানে একটা ফোঁটা—একটা লাল ফোঁটা সেটা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে বড় হয়ে একটা ভয়ঙ্কর, সুন্দর দাগ পড়ল।

বিড়বিড় করে কুজ্যাঁ বল্ল—"আঃ কি মুস্কিল—আবার রক্ত পড়তে আরম্ভ করেছে—কিছুতেই আর শান্তি নেই"

আমি সাহায্যের জন্য লোকজন ডাকলুম। একটা তেলের কাপড় তার উরুর চারপাশে জড়িয়ে দেওয়া হল।

সে বল্ল—"এইবার বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আর চিন্তার কারণ নেই" কথাটা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বল্ল বটে—কিন্তু তার স্বর খুব ক্ষীণ মনে হ'ল—যেন আওয়াজ বেরোল ঠোঁট থেকে।

রক্তপড়া বন্ধ হ'ল। কুজ্যাঁকে পুনরায় অস্ত্র করবার টেবিলে নিয়ে গেল। সেখানে কিছুক্ষণের জন্য সে একটু শান্তি পেয়েছিল। ডাক্তার হাত ধুতে লাগলেন। তারা আস্তে ফিস্ ফিস্ করে কুঁজ্যার কেস্ সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। আমার বুকটা দুর দুর করতে লাগল, মুখের মধ্যে জিবটাও শুকিয়ে উঠতে লাগল।

কুজ্যাঁ আমাকে দূর থেকে দেখে চোখ দিয়ে ইসারা করল। আমি তার কাছে গেলুম। সে বল্ল—

"কিছুতেই সোয়াস্তি নেই। তোমাকে যেন কি বলছিলাম? হ্যাঁ ষ্টাইলের কথা। আমার ওস্তাদি কোথায় জান? যত রকম ষ্টাইল আছে সব আমি জানি—পঞ্চদশ লুই বল, নেপোলীয়ানী বল, ওলন্দাজ বল, আধুনিক বল—আর যাই বল। কিন্তু কাজটা শক্ত। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি——"

ডাক্তার আস্তে বল্লেন—"কুজ্যাঁ এইবার ঘুমোও দেখি"

সে আমায় বল্ল—"এঁদের হয়ে গেলে, জেগে উঠে তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবো" তারপর অতিশান্ত ভাবে সে নিশ্বাসের সঙ্গে ইথার টেনে টেনে নিতে লাগল।

* * *

তারপর আজ এক বছর হয়ে গেল। আমাকে যে সব কথা সে বোঝাবে বলেছিল—কিন্তু বোঝাতে পারে নি—কখনও বোঝাতে পারবে না—অনেক সময় সেই সব কথা ভাবি।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

সম্পাদকের নিবেদন

সবুজ-পত্র যে এ ক'মাস বন্ধ আছে তার কারণ, প্রথমে মনে করেছিলুম যে ও কাগজ ততদিন আর প্রকাশ করব না যতদিন ওটিকে নিয়মিত চালাবার একটা বন্দোবস্ত না করতে পারি।

গত বৎসর কাগজ খানি যে রকম এলোমেলো ভাবে বেরিয়েছে তার জন্য আমি যেমন লজ্জিত তেমনি দুঃখিত। মাসিক পত্রকে ত্রৈমাসিক করে তোলায় সম্পাদক তাঁর দায়ীত্বজ্ঞানের পরিচয় দেন না। অথচ কি করে যে সবুজ-পত্রের প্রকাশ একটা অলঙ্ঘ নিয়মের অধীন করা যায় তার সন্ধান আমি ইতিপূর্ব্বে পাই নি। যদি পেতুম তাহলে—সরকারের চাকরের মাহিনার মত সবুজ-পত্র প্রতিমাসের পয়লা তারিখে ঠিক বেরত।

কি উপায়ে সবুজ-পত্রের প্রচার বাড়ানো যায়,-সে বিষয়ে আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আমি সে সকল অবলম্বন করতে পারি নি। আমার বিশ্বাস-সে সব উপায় অবলম্বন করা সবুজ-পত্রের পক্ষে বৃথা।

আসল কথা সবুজ-পত্র যে কালের হিসেবে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে সে গ্রাহকের অভাবে নয়—লেখকের অভাবে। এ পত্রের প্রতি পাঠকেরা ততটা অসদয় যতটা লেখকেরা। আর একটা মাসিক পত্র যে একহাতে চালানো যায় না—সে কথা বলাই বাহুল্য। লেখকের সংখ্যা বাড়াবার উপায় আমিও অদ্যাবধি আবিষ্কার করি নি, এবং কি করে যে তা করতে হয়, তার সন্ধান অপর কেউও

আমাকে আজও দেন নি,—এমন কি তাঁরাও নন্ যাঁদের কাছে গ্রাহকের সংখ্যা বাড়বার সর্ব্ববিধ সদুপায় সুবিদিত।

শুনতে পাই যে বাঙলা লেখক সমাজের ধারণা যে সবুজ-পত্র একটি বিশেষ দলের কাগজ এবং সে দল যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমনি আত্মম্ভরী—এক কথায় aristocratic। ও ইংরাজি শব্দটি আমি মুখে আনতুম না, যদি কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি মহাশয় সবুজ-পত্রকে উক্ত বিশেষণে ভূষিত না করতেন। এ অভিযোগের বিরুদ্ধে কোনও জবাব দাখিল করবার প্রয়োজন নেই, কেননা বাগচি মহাশয় সবুজ-পত্রকে অমৃতবাজার পত্রিকার সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করেছেন। এ দুই পত্র যে একজাতীয় একথা পূর্ব্বেও শুনেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ইনস্পেক্টর মহোদয় অমৃত-বাজার পত্রিকার পিঠ পিঠ সবুজ-পত্রকেও কোন একটি কলেজ থেকে বহিস্কৃত করে দেবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বাগবাজার পত্রিকা যে ভাবে, ভঙ্গিতে, ভাষায়, ও ছাপায় অভিজাত্য কলুষিত, এমন কথা উক্ত ইন্স্পেক্টর মহাশয়ও বলেন নি। তবে যখন দেখা যাচ্ছে যে বাঙলা কবির সঙ্গে ইংরাজি অধ্যাপকের মতের মিল আছে, তখন মানতেই হবে যে সবুজ-পত্রের সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকারও মিল আছে। কিন্তু সে ঐক্য হয়ত এত গূঢ় এত মৌলিক যে তা দেখবার শক্তি সহজ চোখে নেই—আছে সুধু কবির শিবনেত্রে আর ইনস্পেক্টরের অশিব-নেত্রে।

সে যাই হোক এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে কোনরূপ বাজারে পত্রিকা হয়ে ওঠবার সামর্থ সবুজ-পত্রের শরীরে নেই। তা হতে চেষ্টা করলে, সবুজ-পত্র কালে অমৃত না হয়ে অকালে মৃত হবে।

গ্রাহকের দিক থেকেই দেখুন—আর লেখকের দিক থেকেই দেখুন সবাই দেখতে পাবেন যে সবুজ-পত্র একটি minorityর কাগজ। কিন্তু এ minority সাম্প্রদায়িক নয়। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাক্।

যাঁরা আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন্ যে মনের রাজ্যে আমি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। যে দেশে কিম্বা যে সমাজে মানুষের নিজের চোখ দিয়ে দেখবার নিজের মন দিয়ে ধারণা করবার নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করবার হয় প্রবৃত্তি নয় শক্তি নেই—সে সমাজ জড় সমাজ। সুতরাং সমাজকে সজীব ও সতেজ করবার শ্রেষ্ট উপায় হচ্ছে ব্যক্তি মাত্রকেই নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অধিকার দেওয়া। এ বিশ্ব বহুরূপী—আর সৃষ্টির অর্থই হচ্ছে বৈচিত্র্যসৃষ্টি। কি জীব-জগতের কি মনোজগতের এই বিপুল বৈচিত্র্যের মুলে আছে আত্মার স্বাধীন স্ফুর্ত্তি। জীবনের ও মনের এই স্বাধীন স্ফুর্ত্তিতে যিনি বাধা দিতে চান, তিনি মুখে যাই বলুন তিনিই হচ্ছেন যথার্থ জড়ভক্ত। একটি ইতালীয় দার্শনিক Croce বলেছেন যে spirit এবং liberty এই দুই শব্দের অর্থ এক। এ কথা আমি সানন্দে শিরোধার্য্য করি। সুতরাং আমি প্রতি ব্যক্তিকেই তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে দেবার একান্ত পক্ষপাতী। যাকে আমরা ডিমোক্রাসি বলি তার আধ্যাত্মিক ভিত্তি এই ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। জীবনের স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তির প্রতি অনুকুল বলেই ডিমোক্রাসি গ্রাহ্য।

তবে এ কথাও স্বীকার্য্য যে মনোরাজ্যে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসকে aristocratic মনোভাবও বলা যায়। কেননা এ মত

জনগণের মত নয়। তার কারণ অধিকাংশলোকের মনের কোনও নিজত্ব নেই—এবং তারা স্বাধীনতাও চায় না। তারা চায় সদলবলে প্রভূর দ্বারা চালিত হতে, সে প্রভূ—মনের প্রভুই হোন আর দেহের প্রভূই হোন।

যে ক্ষেত্রে অমি নিজে স্বাধীনতা চাই—বলা বাহুল্য সে ক্ষেত্রে আমি অপরকেও স্বাধীনতা দিতে চাই—এমন কি তাঁকেও—যাঁর মনের সঙ্গে আমার মনের আদৌ মিল নেই। সবুজ-পত্র সকল প্রকার মতকে বক্ষে স্থান দিতে সদাই প্রস্তুত—অবশ্য সে মতের পিছনে যদি মন নামক পদার্থ থাকে, আর তার প্রকাশ যদি সৌজন্যের সীমা অতিক্রম না করে।

সবুজ-পত্রের পুনঃপ্রকাশের অপর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বর্ত্তমানে যে দেশব্যাপী আন্দোলন চলছে, দেখতে পাই যে বাঙলার প্রায় সকল মাসিক পত্র সে সম্বন্ধে প্রায় সমান নীরব। এ মৌনতা স্বাভাবিক নয়। আমরা কবি হই—দার্শনিক হই—বৈজ্ঞানিক হই—ঐতিহাসিক হই—আমরা পলিটিক্স সম্বন্ধে ত কেউ উদাসীন নই। অধীন জাতিকে স্বাধীন করা যে পলিটিকাল আন্দোলনের উদ্দেশ্য সে পলিটিকস্ সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া অধীন জাতির লোকের পক্ষে অসম্ভব। তবে বাঙলার লেখক সম্প্রদায় এ বিষয়ে আলোচনা করেন না কেন? এর এক কারণ হতে পারে, যে বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁদের মন সাড়া দেয় নি—আর এক কারণ হতে পারে যে তাঁরা নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে সাহসী হচ্ছেন না। এ দুটির একটিও যে যথার্থ কারণ তা আমি স্বীকার করতে পারিনে, কেননা তাতে আমার বাঙ্গালী পেট্রিয়টিজমে আঘাত লাগে।

স্বরাজ আমরা সবাই চাই আর দেশের জনসাধারণের মনে যে স্বরাজলাভের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে সে বিষয়ে ত কোনই সন্দেহ নেই। তবে যদি সাহিত্যিকরা বলেন যে আমাদের নব-পলিটিক্সের সকল সূত্র তাঁরা গ্রাহ্য করতে পারেন না, তাহলে আমি বলব যে সেই জন্যই ত তাঁদের মুখ খোলা দরকার। যে ব্যাপারের শুধু একটা কাজের দিক আছে কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবের দিক নেই—সে ব্যাপারের মুল্য অতি কম, ফল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং আমার অনুরোধ বাংলাসাহিত্যিকরা বর্ত্তমান স্বরাজ আন্দোলনের আলোচনা করুণ বিচার করুণ। এই জাতীয় জাগরণের দিনে জাতীয় মনটা যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা তাঁরা করুণ। এই নব পলিটিক্সকে দার্শনিক দর্শনের দিক দিয়ে বিচার করুণ, বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের দিক দিয়ে ঐতিহাসিক ইতিহাসের আলোয় আর কবি কল্পনার সাহায্যে। সবুজ-পত্র সে আলোচনা সাদরে বরণ করে নেবে। আজ কাল বিদ্যার নিন্দা করা একটা ফ্যাসান হয়ে উঠেছে—কিন্তু এ ফ্যাসান চিরদিন থাকবে না। বিদ্যা অবিদ্যার উপর জয়লাভ করবেই। কেননা বিদ্যার অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্তু অবিদ্যার কোনই গুণ নেই। আর এক কথা। স্বরাজ আমরা সবাই চাই কিন্তু স্বরাজ লাভের সদুপায় সম্বন্ধে আমাদের ভিতর বিস্তর মতভেদ থাকতে পারে এবং আছে। সুতরাং ঐ উপায় সম্বন্ধে যাঁর যা মত, তাঁর তা প্রকাশ করবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। বর্ত্তমান কংগ্রেসী মত সমর্থন করার অর্থ যেমন পলিটিক্‌সে যোগ দেওয়া সে মতের প্রতিবাদ করার অর্থও তেমনি পলিটিক্‌সে যোগ দেওয়া। এবং আমার বিশ্বাস অনুকূল ও প্রতিকূল মতের সংঘর্ষেই একটা

জাতীয় মত গড়ে উঠবে। কেননা উক্তরূপ সংঘর্ষের ফলেই বিভিন্ন মতের সুধু স্পর্শ নয় যোগাযোগও ঘটে—এবং তারা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর অনুপ্রবিষ্টও হয়। সুধু সম্বাদী ও অনুবাদী সুর নিয়ে কোনও রাগিণী গড়া যায় না তার জন্য বিবাদি সুরও চাই। সবুজ-পত্রের সম্পাদকের অবশ্য একটা নিজস্ব মত আছে—কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল যদি ইংরাজিতে না লিখে বাঙলায় লেখেন আর aristocratic পত্রের স্পর্শে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচির democratic লেখনীর জাত যদি না যায় তাহলে তাঁদের উভয়ের লেখাই সবুজ-পত্রে পাশাপাশি স্থান পাবে। বিরুদ্ধ মতকে বয়কট করার অর্থ প্রকারান্তরে স্বীকার করা যে সে মতের অন্তরে হয় সত্য নয় শক্তি আছে। যদি কেউ কোনও বিরুদ্ধ মতকে অসত্য অশিব কিম্বা অসুন্দর মনে করেন তাহলে তাঁর একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে সে মতের সঙ্গে সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হওয়া, কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের জয় পরাজয় দুয়ের ফলই সমাজের পক্ষে সমান শুভ। অবশ্য লেখকেরা যদি পরস্পরের সঙ্গে ধর্ম্ম যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে লজিকের ছুরি ও বিদ্রূপের বান উভয়ের প্রয়োগই বৈধ, অবৈধ সুধু gas এর প্রয়োগ কেননা gas মাত্রই অল্পবিস্তর poisonous। অথচ এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, দেশী মনের সঙ্গে বিলেতি ভাব সংযুক্ত হলে—যে বস্তু প্রায়শই জন্মলাভ করে সে হচ্ছে gas।

হাজার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সবুজ-পত্র পুনঃপ্রকাশিত করতে সাহসী হতুম না,—যদি না শ্রীমান সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্বেচ্ছায় এ পত্রের ভার নিতে প্রস্তুত হতেন। ইতি—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

আমাদের সঙ্গীত *

সঙ্গীত-সঙ্ঘ থেকে যখন আমাকে অভ্যর্থনা করবার প্রস্তাব এসেছিল, তখন আমি অসঙ্কোচে সম্মত হয়েছিলেম; কেননা সঙ্গীত-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী, নেত্রী এবং ছাত্রী সকলেই আমার কন্যাস্থানীয়া—তাঁদের কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণ করবার অধিকার আমার আছে। আমাকে কিছু বল্‌তে অনুরোধ করা হয়েছিল, তাতেও আমি কুণ্ঠিত হই নি। তারপরে সহসা যখন সংবাদপত্রে দেখলেম, এ সভায় সর্ব্বসাধারণের নিমন্ত্রণ আছে এবং আমার বক্তৃতার বিষয়টি হবে ভারতীয় সঙ্গীত,—তখন আমি মনে বুঝলেম এ আমার পক্ষে একটা সঙ্কট। বাল্যকাল থেকে আমি সকল বিদ্যালয়েরই পলাতক ছাত্র, সঙ্গীত-বিদ্যালয়েও আমার হাজিরা-বই দেখলে দেখা যাবে আমি অধিকাংশ কালই গরহাজির ছিলেম। এই ব্যাপারে আমার ব্যাকুলতা দেখে উদ্যোগ-কর্ত্তারা কেউ কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, তোমাকে বেশি বলতে হবে না, দু'চার কথায় বক্তৃতা সেরে দিয়ো। আমি তাঁদের এই পরামর্শে আশ্বস্ত হই নি। কেননা, যে-লোক খুব বেশি জানে, সেই মানুষই খুব অল্পকথায় কর্ত্তব্য সমাধা করতে পারে,—যে কম জানে তাকেই ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বল্‌তে হয়। যাই হোক, এখন আমার আর ফেরবার পথ নেই, অতএব

*সঙ্গীত সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে উক্ত।

"যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে" এই সদুপদেশ পালন করবার সময় চলে গেছে।

বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চ্চায় বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ছিলেন সঙ্গীতের আচার্য্য, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে-সব গান সর্ব্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে সখের দলের গান নয়; তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অত্যন্ত যাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না, অর্থাৎ সুরের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়ে নি;—কিন্তু কালোয়াতি সঙ্গীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক্, গীতরসের যে-সঞ্চয় বাল্যকালে আমার চিত্তকে পূর্ণ করেছিল, স্বভাবতই তার গতি হল কোন্ মুখে, তার প্রকাশ হল কোন্ রূপে, সেই কথাটি যখন চিন্তা করে দেখি, তখন তার থেকে বুঝতে পারি সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রকৃতি কি। আজ সভায় আমি সেই কথাটির আলোচনা করব।

আমার মনে যে সুর জমে ছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে, তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলে-বেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে

ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সঙ্গীতের রূপ সে রচনা করলে না, সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট বোঝা গেল না।

আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা-বর্ষণেই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সঙ্গীতেরও এইরকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সঙ্গীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সঙ্গীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলা দেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা দেশে সঙ্গীত কবিতার অনুচর না হোক্, সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত; বাণী তার "ছায়েবানুগতা।" ভজন সঙ্গীতের কথা যদি ছেড়ে দিই, তবে দেখতে পাই পশ্চিমে সঙ্গীত যে-বাক্য আশ্রয় করে, তা অতি তুচ্ছ। সঙ্গীত সেখানে স্বতন্ত্র, সে আপনাকেই প্রকাশ করে।

বাংলা দেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"—সে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে। বাণীর প্রতিই বাঙালীর অন্তরের টান; এই জন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সব চেয়ে বেশি হয়েচে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে ত মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না—এই জন্যে বাংলা দেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।

এর প্রমাণ দেখ আমাদের কীর্ত্তনে। এই কীর্ত্তনের সঙ্গীত অপরূপ। কিন্তু সঙ্গীত যুগলভাবে গড়া—পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা। পদাবলীর সঙ্গেই যেন তার রাসলীলা; স্বাতন্ত্র্য সে সইতেই পারবে না।

সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য যন্ত্রে সব চেয়ে প্রকাশ পায়। বাংলার আপন কোনো যন্ত্র নেই, এবং প্রাচীনকালেই হোক্ আর আধুনিক কালেই হোক্, যন্ত্রে যাঁরা ওস্তাদ তাঁরা বাংলার নন্। বীণ রবাব শরদ্ সেতার এস্রাজ সারেঙ্গি প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বাঁশী বা বৈরাগীর একতারা কিছুই নয়। তা ছাড়া গড়ের বাদ্যের বীভৎস ব্যঙ্গরূপে বাংলা দেশে কন্সর্ট্ নামক যে-যন্ত্রসঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েচে, তাকে সহ্য করা আমাদের লজ্জা এবং তাতে আনন্দ পাওয়ায় আমাদের অপরাধ।

এই সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয়, বাংলা দেশে কাব্যের সহযোগে সঙ্গীতের যে বিকাশ হচ্চে, সে একটি অপরূপ জিনিষ হয়ে উঠবে। তাতে রাগরাগিণীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা থাকবে না, যেমন কীর্ত্তনে তা নেই; অর্থাৎ গানের জাত রক্ষা হবে না, নিয়মের স্খলন হতে থাকবে, কেননা তাকে বাণীর দাবী মেনে চল্‌তে হবে। কিন্তু এমনতর পরিণয়ে পরস্পরের মন জোগাবার জন্যে উভয়পক্ষেরই নিজের জিদ কিছু কিছু না ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না। এই জন্যে গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়। যাই হোক, বাংলা দেশে এই এক-জাতের কাব্যকলা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। অন্ততঃ আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই—গান রচনা,

অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে বাণীর মিলনসাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে, সেখানে তার নিয়ম সংযমের যে-শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে; কিন্তু পরম্পরাগত সঙ্গীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে। কবিতাতেও ছন্দের রীতি আছে—সে রীতি কোনো বড় কবি নিখুঁৎভাবে সাবধানে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করেন না—অর্থাৎ তাঁরা নিয়মের উপরেও কর্ত্তৃত্ব করেন—কিন্তু সেই কর্ত্তৃত্ব করতে গেলেও নিয়মকে স্বীকার করা চাই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা, সেখানে কলাবিদ্যার স্থান নেই। এই জন্যে নিজের সৃজন শক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই, শিক্ষা ও সংযমশক্তির বেশি দরকার হয়।

সঙ্গীত-সঙ্ঘ আমাদের দেশের সঙ্গীতকে দেশের মেয়েদের কণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করবার ভার নিয়েচেন। তাঁদের এই সাধনার গভীর সার্থকতা আছে। আমাদের দুই রকমের খাদ্য আছে, একটি প্রয়োজনের, আরেকটি অপ্রয়োজনের,—একটি অন্ন, আরেকটি অমৃত। অন্নের ক্ষুধায় আমরা মর্ত্ত্যলোকের সকল জীবজন্তুর সমান, অমৃতের ক্ষুধায় আমরা সুরলোকের দেবতাদের দলে। সঙ্গীত হচ্চে অমৃতের নানাধারার মধ্যে একটি। দেশকে অন্নের পরিবেষণ ত মেয়েদের হাতেই হয়, আর অমৃতের পরিবেষণও কি তাঁদের হাতেই নয়?

এ কথা মনে রাখতে হবে, যা অমৃত, যা প্রয়োজনকে অতিক্রম করে আপনাকে প্রকাশ করে, মনুষ্যত্বের চরম মহিমা তাতেই। যে

জাতি পেটুক, সে কেবলমাত্র নিজের প্রতিদিনের গরজ মিটিয়ে চলেচে, মৃত্যুতেই তার একান্ত মৃত্যু। গ্রীস্ যে আজও অমর হয়ে আছে, সে তার ধনেধান্যে রাষ্ট্রীয়প্রতাপে নয়; আত্মার আনন্দরূপ যা-কিছু সে সৃষ্টি করেচে, তাতেই সে চিরদিন বেঁচে আছে। প্রত্যেক জাতির উপরে ভার আছে, সে মর্ত্ত্যলোকে আপন অমরলোকের সৃষ্টি করবে। গ্রীস্ সেই নিজের অমরাবতীতে আজও বাস করচে। সঙ্গীত মানবের সেই আনন্দরূপ—সে মানবের নিজের অভাব মোচনের অতীত বলেই সর্ব্বমানবের এবং সর্ব্বকালের;—রাজ্য সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু এই আনন্দরূপ চিরন্তন।

যে-সকল ঘোরতর প্রবীণ লোক ওজনদরে জিনিষের মূল্য বিচার করেন, সারবান বল্‌তে যাঁরা ভারবান বোঝেন, তাঁরা সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যাকে সৌখীনতা বলে অবজ্ঞা করে থাকেন। তাঁরা জানেন না, যাদের বীর্য্য আছে সৌন্দর্য্য তাদেরই। যে শক্তি আপনাকে শক্তিরূপেই প্রকাশ করে, সে হল পালোয়ানি; কিন্তু শক্তির সত্যরূপ হচ্চে সৌন্দর্য্য। গাছের পূর্ণ শক্তি তার ফুলে; তার মোটা গুঁড়িটার মধ্যে সে কেবল আপনিই থাকে, কিন্তু তার ফুলের মধ্যে সে যে ফল ফলায় তারই বীজের ভিতর ভাবীকালের অরণ্য, অর্থাৎ তার অমরতা। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যায় প্রাণশক্তি আপন অমরতাকে ফলিয়ে তোলে, আপিস আদালতে কলে কারখানায় নয়। উপনিষদ বলেচেন, জন্মেচে বলেই সকলে অমর হয় না, যারা অসীমকে উপলব্ধি করেচে অমৃতাস্তে ভবন্তি। অভাবের উপলব্ধিতে কাপড়ের কল, পাটের বস্তার কারখানা,—অসীমের উপলব্ধিতেই সঙ্গীত। অসীমের উপলব্ধিতেই আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা। যে-সৃষ্টিকর্ত্তা চন্দ্রসূর্য্যের

সিংহাসনে বসে দরবার করচেন, তিনি যে গুণী জাতিকে শিরোপা দিয়ে বলেন, "সাবাস, আমার সুরের সঙ্গে তোমার সুর মিলচে"—সেই ধন্য, সেই বেঁচে যায়, তাঁর অমৃত সভার পাশে তার চিরকালের আসন পাকা হয়ে থাকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিক্ষার মিলন

একথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েচে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করচে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখচি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্চে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাক্‌লে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে; মনে মনে ভাবি যে-মানুষটা খাচ্চে ওটাকে একবার সুযোগমত পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কি, ঐই আমাদের পেয়ে বসেচে; সুযোগ এপর্য্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পৌঁছয় নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েচে? নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোরে। আমরা কোনো উপায়ে দল বেঁধে বাইরে থেকে ওদের খোরাক বন্ধ করে নিজের খোরাক বরাদ্দ করব, কথাটা এতই সোজা নয়। ড্রাইভারটার মাথায় বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখনি আমার বশে চল্‌বে, একথা মনে করা ভুল। বস্তুত ড্রাইভারের মূর্ত্তি ধরে ওখানে একটা বিদ্যা, এঞ্জিন চালাচ্চে। অতএব শুধু আমার রাগের আগুনে এঞ্জিন চল্‌বে না, বিদ্যাটা দখল করা চাই, তা হলেই সত্যের বর পাব।

মনে কর, এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে, মোটর তারি হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি

করে? অন্য ছেলেটি ভাল মানুষ, সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন্‌ দিকে কেমন করে ঘোরাচ্চে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারখানা পুরো-পুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে ঊর্দ্ধস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ি চালাবার সখ দিনরাত এমনি তাকে পেয়ে বস্‌ল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁসই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে-রথের রথী তাঁর ছেলেও যে সেই রথেরই রথী এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালমানুষ ছেলে দেখ্‌লে ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়াগাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্চে, তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধ্রুবং,—তখনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বল্‌লে, আমার আর কিছুতে দরকার নেই।

কিন্তু দরকার নেই বলে কোনো সত্যকার দরকারকে যে-মানুষ খাটো করেচে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক দরকারেরই একটা মর্য্যাদা আছে সেই টুকুর মধ্যে তাকে মানলে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্চে পরীক্ষায় পাশ করা।

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা

কল। সেদিকে তার বাঁধা নিয়মের একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুঁড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি নিজেকেই ফাঁকি দিয়েচে; অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেচে, শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেচে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েচে। বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে। সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে; আর পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে, যে, তাদের ভাগ্যে, হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোক যে-বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেচে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু একথা যদি বল, সুধু ত বিদ্যা নয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সয়তানীও আছে, তাহলে বলতে হবে ঐ সয়তানীর যোগেই ওদের মরণ। কেননা সয়তানী সত্য নয়।

জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটা-কেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড় স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড় গৌরবের পদ দখল করে বসেচে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়। ইতি-হাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেচে বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্ত্তৃত্ব

করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেচে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য কর্ত্তে পারে তাহলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্ত্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্র তন্ত্র নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল জগতে যা-কিছু ঘটচে এসমস্তই একটা অদ্ভুত যাদুশক্তির জোরে; অতএব তারও যদি যাদু-শক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগে সে কর্ত্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

সেই যাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা সুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্চে মানব না, মানাব। অতএব যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেচে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েচে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটু ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেচে, আর তারা বাহিরের জগতের সকল সঙ্কট তরে' যাচ্চে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে যাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায়, এবং দায়ে ঠেকলে যাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাহিরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরচে, তারা আর কর্ত্তৃত্ব পেলনা।

পূর্ব্বদেশে আমরা যে-সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকচি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়চ্চি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্চি শীতলা দেবীর পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেচি, ঠিক সেই সময়ে

পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টায়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শুনেচি না কি, মন্ত্রগুণে পাল্‌কে-পাল্ ভেড়া মেরে ফেলা যায়; সে কি সত্য?" ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, "নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়; কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।" য়ুরোপের কোনো কোণে-কানাচে যাদুমন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছে না করলেও মর্‌তে পারি।

আজ একথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বশক্তি হচ্চে ক্রটিবিহীন বিশ্ব-নিয়মেইর রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে; এই জন্যে এই নিয়মের পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেচি। বিশ্বব্যাপারে যে-মানুষ আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকেতাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না, তখন সে আর সন্ধান করতে চায় না, প্রশ্ন করতে চায় না,—তখন সে বাইরের দিকে কর্ত্তাকে খুঁজে বেড়ায়, এই জন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠক্‌চে, পুলিসের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্য্যন্ত। বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্চে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।

পশ্চিম দেশে পোলিটিকাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ

হয়েচে কখন্ থেকে? অর্থাৎ কখন্ থেকে দেশের সকল লোক এই বুঝেচে যে রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিষ নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে। যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেচে। যখন থেকে তারা জেনেচে সেই-নিয়মই সত্য যে-নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না। বিপুলকায় রাশিয়া সুদীর্ঘকাল রাজার গোলামী করে এসেচে, তার দুঃখের আর অন্ত ছিল না। তার প্রধান কারণ, সেখানকার অধিকাংশ প্রজাই সকল বিষয়েই দৈবকেই মেনেচে নিজের বুদ্ধিকে মানে নি। আজ যদি বা তার রাজা গেল, কাঁধের উপরে তখনি আর-এক উৎপাত চড়ে বসে তাকে রক্ত সমুদ্র সাঁৎ-রিয়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষের মরুডাঙায় আধ-মরা করে পৌঁছিয়ে দিলে। এর কারণ, স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাহিরে নয়, যে-আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে।

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলুম, "সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল একখানা চালাও বাঁচাতে পারলিনে কেন?" তারা বল্‌লে, "কপাল!" আমি বল্‌লেম, "কপাল নয়রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস্‌নে কেন?" তারা তখনি বল্‌লে "আজ্ঞে, কর্ত্তার ইচ্ছে হলেই হয়।" যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব তাদেরই জলদান করবার ভার কোনো একটি কর্ত্তার। সুতরাং যে করে হোক্ এরা একটা কর্ত্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের কপালে আর সকল অভাবই থাকে কিন্তু কোনোকালেই কর্ত্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েচেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্ত্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেচেন, যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ—অর্থাৎ অর্থের বিধান তিনি যা করেচেন সে বিধান যথাতথ, তাতে খামখেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বতকালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্চে অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্য পাকা করে দিয়েচেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্ব্বল হয়ে থাক্‌তে হত; কেবলি এ-ভয়ে ও-ভয়ে সে-ভয়ে পেয়াদার ঘুস জুগিয়ে ফতুর হতে হত। কিন্তু তাঁর পেয়াদার ছদ্মবেশধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েচে যে-দলিল সে হচ্চে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল,—তারই মহা অশ্বাসবাণী হচ্চে যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ—তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেচেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েচেন :—"বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চল্‌বে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম, একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম আরেক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম; এই দুয়ের যোগে তুমি বড় হও,—জয় হোক্ তোমার,—এরাজ্য তোমারই হোক্—এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।" এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেচে, অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে,আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্ত্তাভজা, পলিটিকেল বিভাগেও কর্ত্তাভজা হওয়া ছাড়া তার আর গতি নেই। বিধাতা স্বয়ং যেখানে কর্ত্তৃত্ব দাবী করেন না সেখানেও যারা কর্ত্তা জুটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন, সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে, তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার আমদানী হবে, কেবল ছোট্ট ঐ "স্ব" টুকুকে বাঁচানোই দায় হবে।

মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েচে তার বাসাটা পূর্ব্বেই হোক্ আর পশ্চিমেই হোক্ তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। দৈত্য বলচি আমি, বিশ্বের সেই শক্তিরূপকে, যা সূর্য্য নক্ষত্র নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাঠিম ঘুরিয়ে বেড়ায়; সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ শুক্রাচার্য্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যকরূপে জীবনরক্ষা হয়, জীবন পোষণ হয়, জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যা যথাতথ বিধির বিদ্যা, এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিল্‌বে তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্য উপায় নেই।

এই শিক্ষা থেকে ভ্রষ্টতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—হিন্দুর কুয়ো থেকে মুসলমানে জল তুল্‌লে তাতে জল অপবিত্র করে। এটা বিষম মুস্কিলের কথা। কেননা পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের,

আর কুয়োর জলটা হল বস্তুরাজ্যের। যদি বলা যেত মুসলমানকে ঘৃণা করলে মন তাহলে অপবিত্র হয় সেকথা বোঝা যেত কেননা সেটা আধ্যাত্মিক মহলের কথা; কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপবিত্রতা আছে বল্‌লে তর্কের সীমানাগত জিনিষকে তর্কের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়। পশ্চিম ইস্কুলমাষ্টারের আধুনিক হিন্দুছাত্র বল্‌বে "আসলে ওটা স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা।" কিন্তু স্বাস্থ্য-তত্ত্বের কোনো অধ্যায়ে ত পবিত্রতার বিচার নেই। ইংরেজের ছাত্র বল্‌বে, "আধিভৌতিকে যাদের শ্রদ্ধা নেই আধ্যাত্মিকের দোহাই দিয়ে তাদের ভুলিয়ে কাজ করতে হয়।" এ জবাবটা একেবারেই ভাল নয়, কারণ যাদের বাইরে থেকে ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে হয়, চিরদিনই বাইরে থেকে তাদের কাজ করাতে হয়, নিজের থেকে কাজকরার শক্তি তাদের থাকে না সুতরাং কর্ত্তা না হলে তাদের চলেই না। আর একটি কথা, এই ভুল যখন সত্যের সহায়তা কর্ত্তে যায় তখনো সে সত্যকে চাপা দেয়। "মুসলমানের ঘড়া হিন্দুর কুয়োর জল অপরিষ্কার করে," না বলে' যেই বলা হয় "অপবিত্র করে" তখনই সত্য নির্ণয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়। কেননা কোনো জিনিষ অপরিষ্কার করে কি না করে সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ। সেস্থলে হিন্দুর ঘড়া, মুসলমানের ঘড়া, হিন্দুর কুয়োর জল, মুসলমানের কুয়োর জল, হিন্দু পাড়ার স্বাস্থ্য, মুসলমান পাড়ার স্বাস্থ্য যথানিয়মে ও যথেষ্ট পরিমাণে তুলনা করে' পরীক্ষা করে দেখা চাই। পবিত্রতাঘটিত দোষ অন্তরের কিন্তু স্বাস্থ্যঘটিত দোষ বাইরের, অতএব বাইরে থেকে তার প্রতিকার চলে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব হিসাবে ঘড়া পরিষ্কার রাখার নিয়ম বৈজ্ঞানিক নিয়ম, তা মুসলমানের

পক্ষেও যেমন হিন্দুর পক্ষেও তেমনি, সেটা যাতে উভয় পক্ষে সমান গ্রহণ করে' উভয়ের কুয়ো উভয়েই ব্যবহার করতে পারে সেইটেই চেষ্টার বিষয়। কিন্তু বাহ্যবস্তুকে অপরিষ্কার না বলে অপবিত্র বলার দ্বারা চিরকালের জন্যেই এ সমস্যাকে সাধারণের বাইরে নির্ব্বাসিত করে রাখা হয়। এটা কি কাজ-সারার পক্ষেও ভাল রাস্তা? একদিকে বুদ্ধিকে মুগ্ধ রেখে আরেক দিকে সেই মূঢ়তার সাহায্য নিয়েই ফাঁকি দিয়ে কাজ চালানো এটা কি কোনো উচ্চ অধিকারের পথ? চালিত যে তার দিকে অবুদ্ধি আর চালক যে, তার দিকে অসত্য, এই দু'য়ের সম্মিলনে কি কোনো কল্যাণ হতে পারে? এই রকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্য্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিমদুয়ারী বলে যদি খামকা বলে বসি ও ঘরটা অপবিত্র তাহলে যে-বিদ্যা বাহিরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে-বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোট করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠবার আশঙ্কা আছে। একথা অনেকে বল্‌বেন, পশ্চিম দেশে যখন বুনো ছিল, পশুচর্ম্ম পরে মৃগয়া করত তখন কি আমরা নিজের দেশকে অন্ন জোগাইনি বস্ত্র জোগাইনি? ওরা যখন দলে দলে সমুদ্রের এপারে ওপারে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত আমরা কি তখন স্বরাজশাসনবিধি আবিষ্কার করিনি। নিশ্চয় করেচি কিন্তু কারণটা কি? আরত কিছুই নয়, বস্তুবিদ্যা ও নিয়ম-তত্ত্ব ওরা যতটা শিখেছিল আমরা তার চেয়ে বেশি শিখেছিলেম। পশুচর্ম্ম পরতে যে বিদ্যা লাগে তাঁত বুনতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যার দরকার, পশু মেরে খেতে যে বিদ্যা খাটাতে হয় চাষ করে

খেতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যা লাগে। দস্যুবৃত্তিতে যে বিদ্যা, রাজ্য চালনে ও পালনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাটা যদি একেবারে উল্টে গিয়ে থাকে তার মধ্যে দৈবের কোনো ফাঁকি নেই। কলিঙ্গের রাজাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে বনের ব্যাধকে আজ সিংহাসনে যে চড়িয়ে দিয়েচে সেত কোনো দৈব নয় সে ঐ বিদ্যা। অতএব আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্য ক্রিয়া কলাপে কম্‌বে না,—ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পার্‌লে তবেই ওদের সাম্‌লান যাবে। একথার একমাত্র অর্থ আমাদের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা শিক্ষাসমস্যা। অতএব শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্চে।

এই পর্য্যন্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সাম্‌নে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়; "সব মান্‌লেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ?" না, পাইনি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেচি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্য্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বল্‌চিনে—ইরাজিতে বল্‌তে হলে হয়ত বল্‌তেম titanic wealth। অর্থাৎ যে-ঐশ্বর্য্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সাম্‌নে বসে থাক্‌তেম আর মনে মনে বল্‌তেম, লক্ষ্মী হলেন এক আর কুবের হল আর—অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্চে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে; কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্চে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার,

চুগুণে আট, আট দুগুণে ষোল, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মত লাফিয়ে চলে—সেই লাফের পাল্লা কেবল লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে, তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরীর মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়। আর যে লোক বাইরে বসে আছে তার যে কত বড় পীড়া এইখানে তার একটা উপমা দিই।

একদিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজ্‌রার জান্‌লায় বসে ছিলেম, সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অদূরে ডাঙার উপরে এক গহনার নৌকার ভোজপুরী মাল্লার দল উৎকট উৎসাহে আত্মবিনোদনের কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কারো হাতে ছিল মাদল, কারো হাতে করতাল। তাদের কণ্ঠে সুরের আভাসমাত্র ছিল না কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। খচমচ শব্দে তালের মাচন ক্রমেই দূন চৌদূন লয়ে চড়তে লাগল। রাত এগারটা হয়, দুপুর বাজে, ওরা থামতেই চায় না। কেননা, থামবার কোনোই সঙ্গত কারণ নেই। সঙ্গে যদি গান থাকত তাহলে সমও থাক্‌ত; কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে, শান্তি নেই; উত্তেজনা আছে পরিতৃপ্তি নেই। সেই তাল-মাতালের দল প্রতিক্ষণেই ভাবছিল, ভরপুর মজা হচ্চে। অমি ছিলেম তাণ্ডবের বাইরে, আমিই বুঝছিলেম গানহীন তালের দৌরাত্ম্য বড় অসহ্য।

তেমনি করেই আটলান্টিকের ওপারে ইট পাথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেচে—"তালের খচমচর অন্ত নেই কিন্তু সুর কোথায়?" আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই, এ বাণীতে ত সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন সেই ভ্রূকুটি

কুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেচে, ততঃ কিম্!

এ কথা বারবার বলেচি আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করিনে। আমি এই বলি,—অন্তরে গান বলে সত্যটি যদি ভরপুর থাকে তবে তার সাধনায় সুর তাল রসের সংযম রক্ষা করে—বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। কোলাহলের উচ্ছৃঙ্খল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অন্তরের অন্তরে প্রেম বলে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত, সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হয় প্রকৃত মিলন।

যখন জাপানে ছিলেম তখন প্রাচীন জাপানের যে-রূপ সেখানে দেখেছি সে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছে। কেননা অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন হৃৎপদ্মের মাঝখানে সুন্দরকে পেয়েছিল। তার সমস্ত বেশভূষা, কর্ম্ম খেলা, তার বাসা আস্‌বাব, তার শিষ্টাচার ধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্তই একটি মূল ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে সেই এককে, সেই সুন্দরকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করেচে। একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি। প্রাচীন জাপানের যে জিনিষটি আমার চোখে পড়েছিল তা রিক্ততাও নয় বহুলতাও নয়, তা পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই মানুষের হৃদয়কে আতিথ্য দান করে; সে ডেকে আনে, সে তাড়িয়ে দেয় না। আধুনিক জাপানকেও এর পাশাপাশি দেখেচি। সেখানে

ভোজপুরী মাল্লার দল আড্ডা করেচে; তালে যে প্রচণ্ড খচমচ উঠেছে সুন্দরের সঙ্গে তার মিলন হল না, পূর্ণিমাকে তা ব্যঙ্গ করতে লাগল।

পূর্ব্বে যা বলেছি তার থেকে একথা সবাই বুঝবেন যে, আমি বলিনে, রেলোয়ে টেলিগ্রাফ কল-কারখানায় কোনোই প্রয়োজন নেই। অমি বলি প্রয়োজন আছে কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না, হৃদয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেইখানে তৈরি হয় তার উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তার অমৃতরূপ। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মানুষের ঈর্ষা বিদ্বেষ; এইখানে তার প্রাচীর, তার পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায় পরকে তাড়ায়; সুতরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অমৃত, যেখানে মানুষ বস্তুকে নয় আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে, সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না, সুতরাং সেইখানেই শান্তি।

য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্যনিকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন যেদিকে চায় সেইদিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেচে, যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ মিল আছে। নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই, কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড় লাভ আছে। চা-বাগানের ম্যানেজার কুলিদের পরে যে-নিয়ম চালনা করে সে নিয়ম যদি পাকা হয় তাহলে চায়ের ফলনের পক্ষে কাজে

লাগে। কিন্তু বন্ধু সম্বন্ধে ম্যানেজারের ত পাকা নিয়ম নেই। তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে চায়ের আয় নেই ব্যয় আছে। কুলির নিয়মটা আধিভৌতিক বিশ্ব-নিয়মের দলে, সেই জন্যে সেটা চা-বাগানেও খাটে। কিন্তু যদি এমন ধারণা হয় যে ঐ বন্ধুতার সত্য কোনো বিরাট সত্যের অঙ্গ নয় তাহলে সেই ধারণায় মানবত্বকে শুকিয়ে ফেলে। কলকে ত আমরা আত্মীয় বলে বরণ করতে পারিনে; তাহলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে-আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায়? একরোখে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করতে করতে পশ্চিম দেশে এই আত্মাকে কেবলি সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। এক-ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্ব্বলতায় কাৎ হয়ে পড়েচি, আর ওরাই কি এক-ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতায় মধ্যে গিয়ে পৌঁচচ্চে?

বিশ্বের সঙ্গে যাদের এমনিতর চা-বাগানানের ম্যানেজারীর সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে যে-সে লোকের পেরে ওঠা শক্ত। সুদক্ষতার বিদ্যাটা এরা আয়ত্ত করে নিয়েচে। ভালোমানুষ লোক তাদের সন্ধানপর আড়কাঠির হাতে ঠকে যায়, ধরা দিলে ফেরবার পথ পায় না। কেন না ভালোমানুষ লোকের নিয়মবোধ নেই, যেখানে বিশ্বাস করবার নয়, ঠিক সেইখানেই আগে ভাগে সে বিশ্বাস করে বসে আছে, তা সে বৃহস্পতিবারের বারবেলা হোক্, রক্ষামন্ত্রের তাবিজ হোক্, উকীলের দালাল হোক, আর চা-বাগানের আড়কাঠি হোক্! কিন্তু এই নেহাৎ ভালোমানুষেরও একটা জায়গা আছে যেটা নিয়মের উপরকার,—সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে, "সাত জন্মে আমি যেন চা-বাগানের ম্যানেজার না হই, ভগবান আমার পরে এই দয়া করো।" অথচ এই অনবচ্ছিন্ন চা-বাগানের ম্যানেজার-সম্প্রদায় নিখুঁৎ করে' উপকার করতে জানে, তাদের কুলির বসতি কেমন করে ঠিক যেন কাঁচি-ছাঁটা সোজা লাইনের পরিপাটি করে বানিয়ে দিতে হয়; দাওয়াইখানা, ডাক্তারখানা হাটবাজারের যে-ব্যবস্থা করে সে খুব পরিপাটি। এদের এই নির্ম্মানুসিক সুব্যবস্থায় নিজেদের মুনফা হয়, অন্যদের উপকার হতে পারে কিন্তু নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।

কেউ না মনে করেন আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বের সম্বন্ধ নিয়েই এই কথাটা বলচি। যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড় করে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেচে। কেননা স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুললে অন্তরতম যে-আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে। অথচ মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠাবাড়ি ওঠে। এদিকে সমাজ ব্যাপারে, শিক্ষা বল আরোগ্য বল, জীবিকার সুযোগ সাধন বল, নানা প্রকার হিতকর্ম্মেও মানুষের যোলোআনা জিত হয়। কেন না পূর্ব্বেই বলেচি বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিসটা সত্য। সেই জন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় ফললাভের দিকে তাদের লোভের অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে, মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।

কিন্তু লোভ ত একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্চে রিপু। রিপুর কর্ম্ম নয় সৃষ্টি করা। তাই, ফললাভের লোভ যখন কোনো সভ্যতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভ্যতা যতই ধন লাভ করে, বললাভ করে, সুবিধা সুযোগের যতই বিস্তার করতে থাকে মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্ব্বল করে।

একা মানুষ ভয়ঙ্কর নিরর্থক; কেননা, একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে-এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক, ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্য। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোট বড় সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়-তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি। এঞ্জিনিয়র সাহেব নীলরঙের মোম-জামার উপর বাড়ির প্ল্যান আঁকেন; তাকে ছবি বলিনে: কেননা সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আত্মিক সম্বন্ধ নয়, বাহির মহলের ব্যবহারিক সম্বন্ধ। তাই ছবি হল সৃজন প্ল্যান হল নির্ম্মাণ।

তেমনি ফললাভের লোভে ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, তবে মানব সমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠকে থাকে ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন। গড়গড় শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তা হোক, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ

নেই, কেননা, কুবেরের পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই বলেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয় নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সইতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিম দেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেচে একথা সুস্পষ্ট। ভারত আচারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েচে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জ্জীব করেচে, য়ুরোপে ব্যবহারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েচে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেচে। কেননা আচারই হোক্ আর ব্যবহারই হোক্ তারাত তত্ত্ব নয় তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।

তত্ত্ব কা'কে বলে? যিশু বলেছেন আমি আর আমার পিতা এক। এ হল তত্ত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে-ঐক্য সেই হল সত্য ঐক্য, ম্যানেজার সঙ্গে কুলির যে-ঐক্য সে সত্য ঐক্য নয়।

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

পশ্চিম সভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেচে পূর্ব্বেই তার নিন্দা করেচি। কিন্তু নিন্দাটা কিসের? ঈশোপনিষদে তত্ত্বস্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েচে। ঋষি বলেচেন, মাগৃধঃ, লোভ কোরো না। "কেন করব না?" যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। "নাইবা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই।" ভোগ কোরোনা, একথা ত বলা হচ্চে না। "ভুঞ্জীথাঃ" ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। 'তাহলে সত্যটা কি?" সত্য হচ্চে এই,

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" সংসারে যা-কিছু চলচে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা কিছু চলচে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর কিছুই না থাক্‌ত, তাহলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সব চেয়ে বড় সাধনা হত। তা'হলে লোভই মানুষকে সব চেয়ে বড় চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েচেন এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা, আর, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে লোভের দ্বারা নয়। সাতমাস ধরে আমেরিকায় আকাশের বক্ষোবিদারী ঐশ্বর্য্যপুরিতে বসে এই সাধনার উল্টোপথে চলা দেখে এলেম। সেখানে "যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" সেটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্চ, আর "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" সেইটেই ডলারের ঘনধূলায় আচ্ছন্ন। এই জন্যেই সেখানে, ভুঞ্জীথাঃ, এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, ধনকে নিয়ে; ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে।

ঐক্য দান করে সত্য, ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন। তাছাড়া সে অন্তরাত্মাকে শূন্য রাখে! সেইজন্যে পূর্ণতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দিনরাত ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে হয়; "আরো" হাঁকতে হাঁকতে হাঁপাতে হাঁপাতে নামতার কোঠায় কোঠায় আকাঙ্ক্ষার ঘোড় দৌড় করাতে করাতে ঘুর্ণি লাগে, ভুলেই যেতে হয় অন্য যা কিছু পাই আনন্দ পাচ্চিনে।

তাহলে চরিতার্থতা কোথায়? তার উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েচেন। তাঁরা বলেন চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে, একটা, দুটো, তিনটে চারটে। আপেল

পড়ার অন্তবিহীন সংখ্যা গণনার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় একথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন ধাক্কাদিয়ে বল্‌বে, "ততঃ কিম্!" তার দৌড়ও থামবে না, তার প্রশ্নের উত্তরও মিল্‌বে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল-পড়া যেমনি একটি আকর্ষণতত্ত্বে এসে ঠেকে অমনি বুদ্ধি খুসি হয়ে বলে ওঠে, বাস্, হয়েচে।

এইত গেল আপেল পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথায়? সেন্সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিন চার পাঁচ? মানুষের স্বরূপ প্রকাশ কি অন্তহীন সংখ্যায়? এই প্রকাশের তত্বটি উপনিষৎ বলেচেন—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্ব্বভূতকে আপনারই মত দেখেন এবং আত্মাকেসর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত, আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধ করে সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রী-বুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর যে-বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্বকে সে মান্‌লে না, সে অকুণ্ঠীত চিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেচে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম্ গিলিয়েচে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েচে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েচে এরচেয়ে স্পষ্ট করে ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি।

আমি জানি, আজকেব দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠ্‌বেন—"ঐ কথাটাইত আমরা বার্‌বার্‌ বলে আস্‌চি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এতবড় হাঁ করেচে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চল্‌তে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে, এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা বিষের মত পরিহার করা চাই। একদিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথা, অপর দিকে এটা সাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথাও নয়। ভারতবর্ষ এই মোহকে সমর্থন করেন নি। তাই মনু বলেচেন,

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

"বিষয়ের সেবা ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়।" এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না, তাকে বিশুদ্ধরূপে পূর্ণ করে তবে উঠ্‌তে হয়। তাই উপনিষৎ বলেচেন, "অবিদ্যায়াং মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে,"—অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃতলাভ হবে। শুক্রাচার্য্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্য-পাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্চে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিম মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েচে। এইটে হচ্চে সাধনার সব নিচেকার ভিত,—

কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামী করতে ব্যস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতের আস্তিন গুটিয়ে খন্তা কোদাল নিয়ে এম্‌নি করে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েচে যে উপরপানে মাথা তোলবার ফুরসৎ তার নেই বল্লেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপরতলা যখন উঠ্‌বে তখনই, হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত, তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্ব-জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেচেন, না জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি। বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিয়ম-তত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্যবন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া,—এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিম মহাদেশ বাহ্যবিশ্বে মায়া-মুক্তির সাধনা করচে, সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে' সেইখানে লাগাচ্চে ঘা, এই হচ্চে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা। আর পূর্ব্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেচে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব পূর্ব্ব পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে; তাই পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষদ দিয়ে গেছেন— বলেচেন,

বিদ্যাং চাবিদ্যাংচ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—এইখানে বিজ্ঞানকে চাই; ঈশাবাস্য মিদং-সর্ব্বং—এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেচেন তখন পূর্ব্ব পশ্চিমকে মিল্‌তে হবে। এই মিলনের

অভাবে পূর্ব্ব দেশ দৈন্যপীড়িত, সে নিৰ্জ্জীব ; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্বসম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। তাই যে-কথাটা একবার আভাসে বলেচি সেইটে আরেকবার স্পষ্ট বলা ভাল। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্ব্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ হচ্চে অজগর সাপের ঐক্যনীতি ; গিলে খাওয়াকেই সে এক-করা বলে প্রচার করে। পূর্ব্বে আমি বলেচি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তাহলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না ; পরস্পর স্বক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাক্‌লে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোট ছোট জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবী প্রবল হয়ে উঠ্‌চে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে ; সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে, আর তাদের মনে রাখতে হবে এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয় নিখিল মানবের মুক্তি।

যারা অন্যকে আপনার মত জেনেচে, ন ততো বিজিগুপ্‌সতে, তারাই প্রকাশ পেয়েচে, এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা

আছে ? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয় ? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি মানুষের দল পর্ব্বতসমুদ্রের এক একটি বেড়ার মধ্যে একত্র হয়েচে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তাহলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মত কেবলি হানিহানি করেচে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়েচে তারা কোন্‌কালে লোপ পেয়েচে। আর যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ পেয়েচে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেচে, এত রথ ছুটেচে যে ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল, অমনি মানুষের সত্যের সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিকশক্তি যাদের একত্র করেচে তাদের এক করবে কে ? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল ত ভালই, নইলে সে দুর্য্যোগ। সেই মহা দুর্য্যোগ আজ ঘটেচে। একত্র হবার বাহ্য শক্তি হু হু করে এগল, এক করবার আন্তরশক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল।—ঠিক যেন গাড়িটা ছুটেচে এঞ্জিনের জোরে, বেচারা ড্রাইভারটা "আরে আরে, হাঁ, হাঁ" করতে করতে তার পিছন পিছন দৌড়েচে, কিছুতে নাগাল পাচ্চে না। অথচ একদল লোক এঞ্জিনের প্রচণ্ড বেগ দেখে আনন্দ করে বল্‌লে," সাবাস্, এ'কেই ত বলে উন্নতি। এদিকে, আমরা পূর্ব্বদেশের ভালোমানুষ, যারা ধীরমন্দগমনে পায়ে হেঁটে চলি, ওদের ঐ উন্নতির ধাক্কা আজও সাম্‌লে উঠতে পারচিনে। কেননা যারা কাছেও আসে

তফাতেও থাকে তারা যদি চঞ্চল পদার্থ হয় তাহলে পদে পদে ঠকাঠক্ ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কার মিলন সুখকর নয় অবস্থাবিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে।

যাই হোক্, এর চেয়ে স্পষ্ট আজ আর কিছুই নয়, যে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্চে অথচ মিলচে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গণ্ডীর ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গণ্ডীর বাইরে তারা এক হতে শেখেনি।

মানুষ, সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় বলেই, সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডীর পূজা ধরে, দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে, রাজাকে ভোলে দারোগাকে কিছুতে ভুল্তে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠ্ল সত্যের জোরে, কিন্তু ন্যাশনালিজ্ম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডীদেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারিদিক থেকে নরবলির যোগান চল্তে লাগ্ল। যতদিন বিদেশী বলি জুট্ত ততদিন কোনো কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্যে স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগ্তে আরম্ভ হল,—"একেই কি বলে ইষ্টদেবতা? এযে ঘর পর কিছুই বিচার করে না।" এ যখন একদিন পূর্ব্বদেশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল, এবং "ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায়, ধরি ধরি চিবায় সমস্ত"—তখন মহাপ্রসাদের ভোজ জমেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবচে, এর পূজো আমাদের বংশে সইবে না। যুদ্ধ যখন পূরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল যুদ্ধ মিট্লেই

অকল্যাণ মিট্বে। যখন মিট্ল তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেচে সন্ধিপত্রের মুখস পরে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড ল্যাজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁতকে উঠেছিল আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই ল্যাজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চলেচে, বোঝা যাচ্চে ঐটাতে আগুন যখন ধরবে তখন কারো ঘরের চাল আর বাকী থাক্বে না। পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে বল্চেন, যে, যে-দুর্ব্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পর ও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্ব্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশনালিজ্ম্, দেশের সর্ব্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উল্টো দিকে, অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান। কিন্তু জাতিতে জাতিতে আজ একত্র হয়েছে এই কথাটা যখন অস্বীকার করবার জো নেই, এতবড় সত্যের উপর যখন কোনো একটা মাত্র প্রবল জাতি আপন সাম্রাজ্যরথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলায় এ'কে ধূলো করে দিতে পারে না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার করতেই হবে তখন ঐ রিপুটাকে এর মাঝখানে আন্লে শকুনির মত কপট দ্যূতের ডিপ্লমাসিতে বারে বারে বারে সে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

বর্ত্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার সঙ্গতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রিয় গণ্ডী-দেবতার যারা পূজারী তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চ্চা করাকে কর্ত্তব্য মনে করে। জর্ম্মণি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিকের ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাস করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেচে। পশ্চিমের কোন্ বড় নেশন্ এ কাজ করে নেই? আসল কথা, জর্ম্মণি সকল ভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি

আয়ত্ত করেচে সেই জন্যে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাতের ডিমে তা দেবার ইন্‌কুবেটার যন্ত্র সে বানিয়েছিল। তার থেকে যে বাচ্ছা জন্মেছিল দেখা গেছে অন্য-দেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দম্ অনেক বেশী। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতে তা দিয়েছিল সে দিককার শিক্ষাবিধি। আর আজ ওদের অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কি? জাতীয় আত্মম্ভরিতার কুশল কামনা করে’ প্রতিদিন অসত্য পীরের সিন্নি মানা।

স্বাজাতের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সর্ব্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে সকল রিপু, যে চিন্তার অভ্যাস ও আচার পদ্ধতি এর প্রতিকূল তা’ আগামী কালের জন্য আমাদের অযোগ্য করে’ তুলবে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে একথা না ভোলায় যে, একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্চে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র। শুন্‌তে পাচ্চি সমুদ্রের ওপারে মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করচে, “আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন চিন্তা, কোন্ কর্ম্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?” তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশ দেশান্তরে পৌঁছুক, যে, “মানুষের একতাকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্‌বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কশ্‌শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

আমরা শুনতে পাচ্চি সমুদ্রের ওপারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বল্‌চে “শান্তি চাই।” এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এই জন্য পিতামহেরা বলেচেন, “শান্তং শিবমদ্বৈতং।” অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরবুদ্ধি আমার মনে আছে সেই জন্যে এই সম্ভবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয়, যে, অতীত যুগের যে আবর্জ্জনাতার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্র দেবতার হুকুম এসে পৌঁচেছে এবং পশ্চিম দেশে সেই হুকুম জাগতে সুরু করেচে আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জ্জনার পীঠ স্থাপনা করে আজ যুগান্তরের প্রত্যুষেও তামসী পূজাবিধি দ্বারা তার অর্চ্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সর্ব্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই; সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্বোধন এনে দেবে না?

এই জন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতন পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে হবে এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটেনি, সহজে মিট্‌তেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য কর্‌তে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই, যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে’ সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্ত্তমানকালে শিক্ষার যত কিছু সরকারী

ব্যবস্থা আছে তার পনেরো আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি, আতিথ্য করে' না বলে' লজ্জা করাও তার ঘুচে যায়, সেই জন্যেই বিশ্বের আতিথ্য করে না বলে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে, আমি ভিখারী, আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা কারো নেই। কে বলে নেই? আমিত শুনেচি পশ্চিমদেশ বারম্বার জিজ্ঞাসা করচে, "ভারতের বাণী কই?" তারপর সে যখন আধুনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন বলে এত সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঙ্গের মত শোনাচ্চে। তাইত দেখি আধুনিক ভারত যখন ম্যাক্সমুলরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই আর্য্য সভ্যতার দম্ভ করতে থাকে তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের-বাদ্যের কড়ি মধ্যম লাগে, আর পশ্চিমকে যখন সে প্রবল ধিক্কারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিমসাগরেই তার সপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব্বভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই কিন্তু তার সাধন সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্ত্তে সে বিশ্বের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে কিন্তু আমি বলি এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, এ'কেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে, কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি

আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্ম্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব, নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্ত্রটি এই :—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মান ন ততো বিজুগুপ্‌সতে।

অভিভাষণ *

—:*:—

য়ুরোপে আমি সমাদর পেয়েচি এবং য়ুরোপকে আমি সমাদর করেচি, কিন্তু হৃদয় আমার উৎকণ্ঠিত ছিল ভারতের জন্যে। শিশু-কাল থেকে ভারতের আকাশ দুই চক্ষু ভরিয়ে আমার মনকে যে আলোক পান করিয়েচে, তার তৃষ্ণা আমার মনে নিয়ত জেগেছিল; আর যারা আমার আপন দেশের লোক, তাদের কাছ থেকে প্রীতি পাবার যে আকাঙ্ক্ষা, সে কি আমার মিটেচে, কিম্বা কোনোকালে মিটবে?—তাই অনেকদিন পরে দেশে ফিরে এসে আপনাদের কাছ থেকে এই যে অভ্যর্থনা লাভ করলেম তা আমার কাছে উপাদেয়।

আমার বয়স যেদিন পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছিল, সেদিন আমার যা-কিছু সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি, সেত এই বাংলা দেশের সীমানা পার হয় নি। কিন্তু সেদিন এই বাংলা সাহিত্য-পরিষদই আমার সম্বর্দ্ধনা করে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। সে কথা আমি ভুলবনা। কেননা সেদিন আমার একমাত্র পরিচয় বাংলা ভাষার মধ্যে বাঙালীর কাছে, অর্থাৎ সে ছিল আত্মীয়ের পরিচয় আত্মীয়ের কাছে। এই অতি নিকটের পরিচয়ে সকল সময়ে সুবিচারের আশা থাকে না; যে দরমূল্য পাওয়া যায়, তাতে কারো কারো ভাগ্যে ফুলের চেয়ে কাঁটার অংশই বেশি থাকে; এবং যেহেতু তা আত্মীয়ের হাতের দাম,

এইজন্যে তার মধ্যে যে পীড়া থাকে তার বেদনা দুঃসহ। তাই সেদিন সাহিত্য-পরিষৎ আমাকে উপলক্ষ্য করে যে কবি-প্রশস্তি সভা ডেকেছিলেন, সে আমার পক্ষে যেমন বিস্ময়ের তেমনি আনন্দের বিষয় ছিল। সেদিন এই পরিষদের কাণ্ডারী ছিলেন আমার পরম বন্ধু স্বর্গগত রামেন্দ্র সুন্দর। তাঁর বুদ্ধির গভীরতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য্য দুইই ছিল অসামান্য; সেদিন তিনি বাঙালীর প্রতিনিধিরূপে এই বরণ-সভা আহ্বান করেছিলেন, এই আনন্দ এবং গৌরব সকলের চেয়ে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। জনসভার অনেক অংশই আনুষ্ঠানিক, প্রায় তা কাঠখড়েই তৈরি,—একদিন তার সমারোহ, পরদিন তা বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দেবার যোগ্য। কিন্তু সেই আমার বন্ধুর নির্ম্মল হাস্যে এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় সেদিনকার সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ বাণীর মধ্যে আমার পক্ষে এই আশ্বাস ছিল যে, এই প্রীতি বর্ত্তমানের সমস্ত বিরোধ বিদ্বেষ, সমস্ত কলহ কলুষের উপরকার জিনিষ, এই প্রীতি সেই ভবিষ্যতের, যা, বাহির থেকে নিকটের মানুষকে দূরে নিয়ে গিয়ে অন্তরের দিকে তাকে নিকটতর সত্যতর করে। আজ তিনি স্বয়ং শাশ্বতলোকে গমন করেছেন, যেখান হতে তাঁর প্রসন্ন হাস্যের অভিনন্দন আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করি।

দশ বৎসর হেয়ে গল। এখন আমি ষাট উত্তীর্ণ হয়েচি। সাহিত্য-পরিষদে আজ আপনাদের এই অভিভাষণ কিসের উপলক্ষ্যে? আজ এখানে কেবল স্বাদেশিক আত্মীয়সভার মঙ্গলাচরণ নয়। ভৌগোলিক ভাগবিভাগের দ্বারা মানুষের যে আত্মীয়তা খণ্ডিত, আজ সেই আত্মীয়তার চতুঃসীমানার মধ্যে এই সভার অধিবেশন

বসে নি। যে আত্মীয়তায় আত্মপরের বিচ্ছেদ, দূর নিকটের ভেদ ব্যবধান দূর হয়ে যায়, আজ সেই আত্মীয়তার মাল্য আপনারা আহরণ করেচেন, এই কথাই আমি মনে অনুভব করতে চাই।

আপনারা হয়ত মনে ভাবেন যে, দেশের সাহিত্যকে আমি বিদেশে যশস্বী করে এসেচি, দেশের লোকের কাছে আজ সেই দাবীতেই আমার বিশেষ সম্মান। কিন্তু এই যশকে আপনারা খুব বেশি বড় করে দেখ্‌বেন না। আমি নিজে, সকলের চেয়ে যেটিকে আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি, সে এই সাহিত্যের ফল নয়। য়ুরোপে আমার কাছে যারা হৃদয়ের অনুরাগ অকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্ত করেচে, তাদের অনেকেই সাহিত্যরস-ব্যবসায়ীদলের কেউ নয়। তারা কেবলমাত্র সাহিত্যের বাজার-যাচাই করে আমাকে যশের মূল্য চুকিয়ে দেয় নি, তারা আমাকে প্রীতি দিয়েচে, যা সকল মূল্যের বেশি। অর্থাৎ তারা ওস্তাদ বলে আমাকে শিরোপা দিয়ে বিদায় করে নি, তারা আমাকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করেচে। সেই আত্মীয়তা নিয়ে অত্মশ্লাঘা করা চলে না, তাকে নিয়ে নম্রমনে আনন্দ করাই যায়।

দ্বিজত্ব লাভ করবার একটি তত্ত্ব আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তাতে এই কথা বলে যে, মানুষের প্রথম জন্ম নিজের অহঙ্কারের ক্ষেত্রে। সেই "আমির" ক্ষুদ্র সীমার আবরণ ও বন্ধন ভেদ করে মানুষ যখন অধ্যাত্মক্ষেত্রে অসীমের মধ্যে জন্মলাভ করে, তখনই হয় তার দ্বিতীয় জন্ম। যেমন অধ্যাত্মক্ষেত্রে, তেমনি সংসারের মধ্যেও মানুষের দুটি জন্ম। একটি হচ্চে নিজের দেশের মধ্যে, আরেকটি সকল দেশে। এই দুটি জন্মের সামঞ্জস্যেই মানুষের

সার্থকতা। নিজের হৃদয়ে দেশের সঙ্গে বিশ্বের মিলন সাধন করাতে পারলে তবেই হৃদয়ের মুক্তি।

পঞ্চাশোর্দ্ধে, সংহিতাকার যখন বনব্রজনের ব্যবস্থা করেচেন, সেই সময়ে আমি পশ্চিম মহাদেশে গিয়ে পৌঁছলেম। দেখলেম সেখানে আমার বাসস্থান আছে। দেখলেম সংসারে এই আমার দ্বিতীয় জন্মের মাতৃক্রোড় পূর্ব্ব হতেই প্রসারিত। আপন দেশ থেকে দূরে, যেখানে জন্মগত কোনো দাবী নেই, কর্ম্মগত কোনো দায় নেই, সেইখানে যখন প্রেমের অভ্যর্থনা পাওয়া যায়, তখনি আমরা বিশ্বজননীর সুধাস্পর্শ পেয়ে থাকি। আমার ভাগ্যক্রমে সেই স্পর্শের আশীর্ব্বাদ লাভ করেচি এবং মাতৃভূমিতে বহন করে এনেচি বলেই, আমার রচনার পরে বিশ্ববাণীর প্রসন্নতা লাভ করেচি বলেই, আজ আপনারা আমাকে নিয়ে বিশেষভাবে আনন্দ করচেন।

ভেবে দেখবেন, এই আনন্দের মধ্যে একটি মুক্তির উৎসাহ আছে। দেশ যখন আপনটুকুকে নিয়েই আপনি নিবিষ্ট, তখন সে বিশ্বের অগোচরে থাকে। এই বিশ্বের অগোচরতা একটি মস্ত কারাপ্রাচীর। সঙ্কীর্ণবাসের অভ্যাসে এ কথা আমরা অনেক সময়ে ভুলেই থাকি। হঠাৎ যখন একটা বন্ধ দরজা কোনো একটা হাওয়ায় খুলে যায়, তখন মন খুসি হয়ে ওঠে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁর যে আবিষ্কার নিয়ে প্রথম বিশ্বসভার আহ্বান পেলেন, তাঁর সে আবিষ্কার যে কি, তা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই এখনো স্পষ্ট করে বোঝে নি—কিন্তু দেশের মন হঠাৎ খুসি হয়ে উঠল তার কারণ এই যে, একদিকের দরজা খুলে গেল। সহসা অনুভব করলেম যে, আমরা বিশ্বের মানুষ, কেবলমাত্র দেশের মানুষ নই;

আমাদের প্রাণের সঙ্গে বিশ্বের হাওয়ার, মনের সঙ্গে বিশ্বের আলোর সুগভীর যোগ আছে। স্বাদেশিক প্রাচীরের বদ্ধ জান্‌লা খোলবামাত্র হঠাৎ সামনে দেখতে পাই সর্ব্বজন-বিধাতার রূপটি। এই রূপটি দেখবার জন্যই আমাদের মানবজন্ম।

সাহিত্যের কলাকৌশল বিচার করে আমার লেখার কি মুল্য, সে কথা দূরে রেখে, আজ আমাকে এই গৌরবটুকু ভোগ করতে দিন যে, আমার গানে বা অন্য রচনায় সর্ব্বজন-দেবতার রূপ হয় ত কিছু প্রকাশিত হয়েচে, সেই জন্যেই অন্য দেশের লোকে আমাকে আপন বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় নি। এই নিখিল দেবের সাধন-মন্ত্র ভারতের কবির কানে পৌঁচেছিল কোথা থেকে? ভারতবর্ষেরই তপস্বীদের কাছ থেকে। তাঁরাই একদিন বলেছিলেন, "এষ দেবা বিশ্বকর্ম্মামহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"; যিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বজনের হৃদয়বাসী সেই দেবতাই মহাত্মা; এবং তিনি বিশ্বকর্ম্মা, অর্থাৎ তাঁর সকল কর্ম্মই বিশ্বের কর্ম্ম, ক্ষুদ্র কর্ম্ম নয়।

আজ আপনাদের যে-আতিথ্য লাভ করচি, এ আমি একলা নিতে পারব না। কেন না একলা আমি কোনো আতিথ্য, কোনো সমাদরের যোগ্য নই। আমার রচনায় আমি মহামানবের বাহন, এই বলে যদি আমাকে সমাদর করেন, তবে তাঁর আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তাঁকে ফেরাবেন না; বল্‌বেন না, আজ আমাদের দুঃসময়, আজ আমাদের দরজা বন্ধ। যখন পশ্চিমে ছিলেম, তখন গৌরব করে সকলকে বলেচি, আমি আমার মাতৃভূমির নিমন্ত্রণ পত্রের ভার নিয়ে এসেচি। বলেচি যেখানে মাতার অমৃত অন্নের পরিবেষণ হয়, সেইখানে এস। এসেছিলে একদিন আমাদের

কয়লার খনিতে, আমাদের পণ্যের হাটে। যা সংগ্রহ করে নিয়ে গেছ, তাই নিয়ে তোমাদের পাড়ায় পাড়ায় ঈর্ষার আগুন জ্বল্‌চে। পরস্পরের প্রতি সন্দেহে তোমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র কাঁটাবনের জঙ্গল হয়ে উঠেচে। আজ এস সেই ভাণ্ডারে, যেখানে অন্ন ভাগ করলে তার ক্ষয় হয় না।

য়ুরোপে শুনে এলেম কত জ্ঞানী গুণী সাধক বল্‌চে, তাদের আত্মা ক্ষুধিত। তারা খুঁজ্‌চে শোকের সান্ত্বনা, ক্ষতবেদনার শুশ্রূষা; এই সন্ধানে যদি তারা পূর্ব্ব মহাদেশে যাত্রা করে, তবে যেন দেখ্‌তে পায় আমাদের দ্বার খোলা আছে। আমরা যেন না বলি, "আমরা নিজের ভাবনায় মরচি, পর আমাদের কাছে অত্যন্ত পর, হৃদয় আমাদের বিমুখ।" এতদিন আমরা পরের দিকে তাকিয়ে ছিলেম ভিক্ষা করবার জন্য, তাতে লজ্জার পর লজ্জা পেয়েচি, অভাব পূরণ হয় নি। আজ যদি ধিক্কারের সঙ্গে বলতে পারি পরের কাছে ভিক্ষা করবনা, সে ত ভাল কথা। কিন্তু সেই ক্ষোভে যদি বলি, পরের আতিথ্য করবনা, তবে আরো বেশি লজ্জা। ভিক্ষায় যে দীনতা, অতিথির প্রত্যাখ্যানে যে বিশ্বাবমাননা, তারও অভিশাপ কঠিন! আমাদের পিতৃঋণ শোধ হবে কি করে? পিতৃগণের কাছ থেকে আমরা যে উত্তরাধিকার পেয়েছি, সে কি কেবল আমাদের নিজেরই জন্য? সে কি আমাদের ন্যস্ত ধন নয়? আমরা যদি বিশ্বের কাছে তার পূর্ণ ব্যবহার না করি তবে তাতে করে আমাদের পিতামহদের অগৌরব।

শকুন্তলা ছিলেন তপোবনের কন্যা। সেই তপোবনের কুটীর-দ্বারে বসে তিনি আপন জনের কথাই ভাবছিলেন, বিশ্বজনের কথা

ভুলে গিয়েছিলেন। ভোলবার কারণ ছিল, কেননা কঠিন দুঃখে তাঁর মন ছিল অভিভূত। এমন সময় অতিথি এল তাঁর দ্বারে, বল্‌লে "অয়মহং ভোঃ।" সে ডাক কানে পৌঁছলনা। তখন তাঁকে বাইরের শাপ লাগ্‌ল, অসম্মানিত অথিতির শাপ। সে শাপ এই যে, যে-আপনজনের ভাবনায় তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে সেই আপনজনকেই হারাবে। বিশ্ব যদি আজ আমাদের দ্বারে এসে বলে "অয়মহং ভোঃ", তবে কি আমরা বল্‌তে পারি যে, "আজ নিজের ভাবনা কঠিন হয়ে উঠেচে; অন্যমনস্ক আছি?" এ জবাব খাটবেনা, নিজের দুঃখধন্দার তাড়ায় বিশ্বকে যে ফিরিয়েচে, বিশ্বের শাপ তাকে লাগ্‌বেই। তার আপনটুকু কেবলি ক্ষীণ হবে, আচ্ছন্ন হবে, নষ্ট হবে। যে সব জাত বিশ্বের অগোচরে নিজের মধ্যে বদ্ধ, তারা নিজেকে হারিয়ে বসে আছে, অথচ এত বড় ক্ষতি অনুভব করবার শক্তি পর্য্যন্ত তার লুপ্ত হয়েচে।

যখন সাহিত্য রচনায় আমি নিবিষ্ট ছিলেম, তখন বাহিরের কোনো সহায় আমার দরকার ছিল না। কবির আসন নির্জ্জনে। সেখানে অনাদরে ক্ষতি করে না, বরঞ্চ অনাদর অনেক সময় মত্ত হস্তীর মত সরস্বতীর পদ্ম বনের পঙ্ক উন্মথিত করে' তোলে। কিন্তু যজ্ঞ ত একলা হয় না। তাতে সর্ব্বলোকের শ্রদ্ধা ও সহায়তা চাই! ঘরে যখন উৎসব, তখন বিশ্ব হন অতিথি। এই জন্যে পাড়া প্রতিবেশী সকলেই এই কাজকে আপনার কাজ বলেই গ্রহণ করেন। কর্ম্মকর্ত্তা দরিদ্র হলেও সেদিন দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে সকলকে ডেকে ডেকে বলেন, "এস, এস!" কিসের জোরে বলেন? সকলের জোরে। দেশের হয়ে আমিও আজ একটি যজ্ঞের ভার নিয়েচি। সত্যের

সাধনায় আমাদের সঙ্গে একাসনে বসবার জন্যে। সেই জন্যেই আজ আপনাদের কাছ থেকে আমি যে অভ্যর্থনা পাচ্চি, এ'কে আমি কবির অভ্যর্থনা বলে একলা গ্রহণ করতে পারব না। এই অভ্যর্থনাকে ভারতের নবযুগে অতিথিসমাগমের প্রথম মঙ্গলাচরণরূপে আমি সকল আগন্তুকের হয়ে গ্রহণ করচি—আপনাদের সকলের সহযোগে মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে বিশ্বচিত্তের একটি মিলনাসন প্রতিষ্ঠিত হোক্‌।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পট

যে-সহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্ব্ব পরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশী, পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যবসা।

সে মনে ভাবে, ধনী ছিলেম, ধন গিয়েচে, হয়েচে ভালো। দিন-রাত দেবতার রূপ ভাবি, দেবতার প্রসাদে খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই মান কে কাড়তে পারে?

এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজা আদর করে আন্‌লে। সেদিন তাই নিয়ে সহরে খুব ধুম।

কেবল অভিরামের তুলি সেদিন চল্‌ল না।

নতুন রাজমন্ত্রী, এই ত সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে, যাকে অভিরামের বাপ মানুষ করে' নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস হল সিঁধকাঠি, তাই দিয়ে বুড়োর সর্ব্বস্ব সে হরণ করলে। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।

যে-ঘরে অভিরাম পট আঁকে সেই তার ঠাকুর ঘর; সেখানে গিয়ে হাতজোড় করে' বল্‌লে, "এই জন্যেই কি এতকাল রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমাকে স্মরণ করে এলেম? এতদিনে বর দিলে কি এই অপমান?

২

এমন সময় রথের মেলা বস্‌ল।

সেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিন্‌তে এল, সেই ভিড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক লস্কর।

সে একটি পট বেছে নিয়ে বল্‌লে, "আমি কিন্‌ব।"

অভিরাম তার নফরকে জিজ্ঞাসা করলে, "ছেলেটি কে?"

সে বল্‌লে "আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।"

অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বল্‌লে, "বেচব না।"

শুনে ছেলের আবদার আরো বেড়ে উঠ্‌ল। বাড়িতে এসে সে খায় না, মুখ ভার করে থাকে।

অভিরামকে মন্ত্রী থলিভরা মোহর পাঠিয়ে দিলে, মোহরভরা থলি মন্ত্রীর কাছে ফিরে এল।

মন্ত্রী মনে মনে বল্‌লে, "এত বড় স্পর্দ্ধা!"

অভিরামের উপর যতই উৎপাত হতে লাগ্‌ল, ততই সে মনে মনে বল্‌লে, "এই আমার জিৎ।"

৩

প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইষ্টদেবতার একখানি করে' ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোন পূজা সে জানে না।

একদিন দেখ্‌লে, ছবি তার মনের মত হয় না। কি যেন বদল হয়ে গেচে। কিছুতে তার ভাল লাগেনা। তাকে যেন মনে মনে মারে।

দিনে দিনে সেই সূক্ষ্ম বদল স্থূল হয়ে উঠ্‌তে লাগল। একদিন হঠাৎ চম্‌কে উঠে বল্‌লে "বুঝতে পেরেচি।"

আজ সে স্পষ্ট দেখ্‌লে, দিনে দিনে তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মত হয়ে উঠ্‌চে।

তুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বল্‌লে, "মন্ত্রীরই জিৎ হল।"

সেই দিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বল্‌লে, "এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "কত দাম?"

অভিরাম বল্‌লে, "আমার দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।"

মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলে না।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর শ্রদ্ধাস্পদেষু

হে কবীন্দ্র! সুদীর্ঘ প্রবাস হইতে বিদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি বহন করিয়া, আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন—স্বদেশী সাহিত্যের সর্ব্বায়তন এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে আজ অভিনন্দন করিতেছে।

পরিষৎ নানা প্রকারে আপনার নিকট ঋণী। পরিষদের শৈশবে আপনি অজস্র স্নেহদানে ইহাকে পোষণ করিয়াছিলেন—পরিষদের কৈশোরে আপনি সহায় হইয়া, ইহার শ্রী ও সম্পদ্‌ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন—আজ পরিষদের যৌবনে আপনি ইহার অকৃত্রিম 'সুহৃৎ সখা'। যখনই অমিত্র-নীরদের ঘন ঘটায় পরিষদের পক্ষে 'পন্থ বিজন অতিঘোর হইয়াছে, তখনই শুভ পথ প্রদর্শন করিয়া, আপনি ইহাকে ঋতমার্গে পরিচালন করিয়াছেন। সেই জন্য পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে বঙ্গের সাহিত্যিকগণের মুখস্বরূপ এই সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দন করিয়া বিশ্বপিতার নিকট আপনার শতায়ুঃ কামনা করিয়াছিল।

যাঁহার অর্চ্চনার জন্য সাহিত্যের এই পুণ্য-পীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হে বরেণ্য! আপনি সেই বাণীর বরপুত্র। যুগ-যুগান্তের সাধনার ফলে দেবী সারদা আপনার চিত্ত-সরোজে তাঁহার রক্তচরণ চিহ্নিত

করিয়াছেন। সেই জন্য সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই আপনি বিজয়ী; সেই জন্য আপনি সাহিত্যের যে বিভাগ যখন স্পর্শ করিয়াছেন, স্পর্শমণির করস্পর্শে সেই বিভাগই স্বর্ণময় হইয়াছে। বীণাপাণির সপ্তস্বরার শততন্ত্রীতে যে বিশ্বসংগীত নিয়ত ঝঙ্কৃত হইতেছে, হে মহাকবি! আপনার হৃদয়-বীণায় তাহার প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

মানব অমৃতের পুত্র—অতএব কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, সে চিরদিন অমৃতত্বের প্রয়াসী। প্রাচীন ভারতের স্নিগ্ধ তপোবনে যে অমৃতের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, সেই পুণ্যপীযুষ পান ভিন্ন কোন মতে তাহার অদম্য ব্রহ্মতৃষার নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া জীবনের ছায়াময় অপরাহ্নে মহর্ষি-সন্তান আপনি কুলোচিত ব্রত গ্রহণ করিয়া, জগৎকে সেই অমৃতবারি মুক্তহস্তে পরিবেষণ করিতেছেন।

বিদ্যাপক্ষিণীর দুই পক্ষ—দর্শন ও বিজ্ঞান। এই পক্ষদ্বয়ে নির্ভর করিয়া, সে প্রজ্ঞানের পর-ব্যোমে নির্ভয়ে বিহরণ করে। পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে বিজ্ঞান আহরণ করুক, পূর্ব্ব পশ্চিমকে দর্শন বিতরণ করুক। এই আদান প্রদানের পূর্ণতায় যে বিদ্যার প্রপূর্ত্তি হইবে, সেই বিদ্যার দ্বারাই "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"। সেই জন্য আপনি "বিশ্ব-ভারতীর" প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে রাখিবন্ধনে সংযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

হে রবীন্দ্র! আপনি সাহিত্যাকাশের দীপ্ত ভাস্বর—জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। যিনি 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' পরম জ্যোতিঃ, যাঁহার

ঊর্জ্জিত বিভূতি আপনাতে দেদীপ্যমান—সেই সত্য শিব সুন্দর আপনাকে জয়যুক্ত করুন। ওঁ।

গুণমুগ্ধ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

১৯এ ভাদ্র, সন ১৩২৮।

আশীর্বচন

—:০:—

শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ,

তুমি যখন নিতান্ত বালক, তখন হইতেই তোমার কবিতায় বাঙ্গালী মুগ্ধ। তোমার যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তোমার প্রতিভা বিকাশ হইতে লাগিল। সে প্রতিভা যেমন একদিকে দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তেমনি সাহিত্যেরও সকল মূর্ত্তিই আয়ত্ত করিতে লাগিল। সে প্রতিভা প্রথম প্রথম কবিতায় আবদ্ধ ছিল, ক্রমে গদ্য, নাটক, নবেল-রচনা, ছোট গল্প, বড় গল্প, সমালোচনা, রাজনীতি, কর্ম্মনীতি, এইরূপে সমস্ত সাহিত্য-সংসারে ছড়াইয়া পড়িল। তুমি সাহিত্যের যে মূর্ত্তিতেই হাত দিয়াছ, তাহাকে উদ্ভাসিত ও সজীব করিয়া তুলিয়াছ। কারণ, তোমার প্রাণ আছে, সে প্রাণে যেমন মধুরতা আছে, তেমনি তেজ আছে—যেমন মোহিনীশক্তি আছে, তেমনি উন্মাদিনীশক্তি আছে—যেমন সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আছে—তেমনি দূরদৃষ্টি আছে। তোমার প্রতিভা যেমন গড়িতে পারে, তেমনই ভাঙ্গিতে পারে—যেমন মাতাইতে পারে—তেমনই ঠাণ্ডা করিতে পারে—যেমন কাঁদাইতে পারে তেমনই হাসাইতে পারে। কিমধিকং, তোমার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, সর্ব্বতঃপ্রসারী এবং সর্ব্বতোমুগ্ধকারী। সঙ্গীতের সহিত সাহিত্যের মিলনে তোমার হাতে উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে; তোমাকেও যশোমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় তুলিয়া দিয়াছে।

ইংরাজ-রাজত্ব হইয়া অবধি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ ধনে মানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে, সদ্গুণে সাহসে বাঙ্গালায় অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন। তোমার প্রতিভায় সেই বংশের গৌরব উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর—উজ্জ্বলতম হইয়া উঠিয়াছে। তোমার গুণে বাঙ্গালা ত চিরদিনই মুগ্ধ—ভারত গৌরবান্বিত, এখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম, নূতন ও পুরাতন সকল মহাদেশেই তোমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সমস্ত পৃথিবী আরও উদ্ভাসিত কর।

তোমার বংশ দীর্ঘজীবীর বংশ, তুমি শতায়ু হও, সহস্রায়ু হও। তোমার বয়স যতই পাকিতেছে, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই মানুষের ব্যথায় তোমার মন গলিতেছে, তোমার বীণার ঝঙ্কার গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। মানবের মঙ্গলের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যতই বাড়িতেছে, ততই তুমি ব্যাকুল হইয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গলাসনের সমীপবর্ত্তী হইতেছে। তোমার মঙ্গলবাসনা চরিতার্থ হউক, তোমার নাম অক্ষয় হউক, তুমি অমর হইয়া ভারতের মঙ্গলকামনা করিতে থাক। তুমি দিগ্বিজয় করিয়া, বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া করিয়া, আবার সোণার বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছ; তুমি আমাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের উপহার স্বরূপ এই পুষ্পমাল্য গ্রহণ কর। বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, সব এই পুষ্পেই আছে। আমাদেরও যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি তাহা তোমাতেই আছে। আইস, উভয়ের মিলন করিয়া দিয়া আমরা কৃতার্থ হই।—ইতি

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি।

রবি-প্রশস্তি

——:০:——

রঞ্জিত করি পশ্চিমতট দীপ্ত প্রতিভাজালে
সূর্য্য আজিকে উদিল পূর্ব্ব উদয়গিরির ভালে
পুণ্য পরশ লভি' আজি তারি জাগ্ ও-রে তোরা জাগ্—
বিশ্ব-সবিতা সেই রবি-করে দে রে দে যজ্ঞভাগ।
সহস্রদল বাণীর কমল মুদিত মানস সরে
দিক্‌দিগন্ত মুগ্ধ করিয়া ফুটিল যাহার বরে,
অমৃতগন্ধ আনন্দরূপে দান করি' যে বা লোকে
নবজীবনের দীপ্তি আনিল মৃত্যু-আহত চোখে,
তাহারি মুক্ত মিলনাঙ্গনে জাগ্ ও-রে তোরা জাগ্—
বিশ্ববিজয়ী সেই রবি-করে দে রে দে যজ্ঞভাগ।

খণ্ডিত নয় এ মহাযজ্ঞ, অনন্ত অফুরণ,—
এই বিশ্বের লোকে লোকে আজ আলোক-নিমন্ত্রণ;
শক্তির মোহ মিথ্যার মায়া সবলে করিয়া দূর
ভুবনধন্যা জীবনবন্যা বহে আজি ভরপুর;
আয় রে পূর্ব্ব আয় পশ্চিম, আয় তোরা সবে আয়
বিশ্বভারতী-মন্দীর-তলে মিলন-মধুচ্ছায়।
যা-কিছু যাহার কলঙ্ককালি, যাহা 'অচলায়তন,,
সত্য-আলোকে ধুয়ে নে রে লভি' সে দীপ্ত বরিষণ।

মর্ম্মপুটের মণির মুকুর উচ্চে তুলিয়া ধর—
সবার ঊর্দ্ধে জ্বলুক সে আজি শাশ্বত ভাস্বর।

জগৎ-সভায় রবি তুমি আজ নহ শুধু আর কবি,
অমৃত প্রতিভা ভাণ্ডার-ভরা তুমি আলো-করা রবি;
তোমারি প্রভায় উজল সপ্ত সাগর, সাগর-পার,
পূর্ব্বোত্তর দক্ষিণদিশি উজ্জ্বল চারিধার;
কুরুক্ষেত্র-কালরাত্রির তমসার অবসানে
তোমারি কিরণ দূর পশ্চিমে নব জাগরণ হানে।
বিশ্ব-সভার মহা-রাজসূয়ে তুমি পুরুষোত্তম,
কর্ম্মের রথী ধর্ম্ম-সারথি জ্ঞানে মানে অনুপম;
শিশুপাল ছাড়া তোমারে সকলে বরিষ্ঠ সম্মানে
অর্পিছে আজি প্রাণের ভক্তি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যদানে।

লহ ওগো লহ আজি এ অর্ঘ ঊর্দ্ধ আকাশপথে
যেথা তব মহাবিজয়যাত্রা শুভ্র আলোকরথে;
চন্দ্র যেথায় অতন্দ্র চোখে সাজায় বরণডালা,
কাতারে কাতারে শোভিছে লক্ষ নক্ষত্রের মালা,
জ্যোৎস্না বিছায় অঞ্চলবাস ছায়া-পথখানি পরে,
মেঘেরা মিলিয়া চরণের তলে শঙ্খধ্বনি করে,
সঙ্গীতে মাতি গ্রহেরা ফিরিছে অনুগ্রহের লাগি',
নাচে ছয় ঋতু মোহন নৃত্যে চির দিনরাত জাগি:
জানি না সেথায় পঁহুছিবে কি না এ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—

জানি শুধু দীন যাত্রী জনের তুমি চিরনির্ভর।
কেন দীন বলি? আমারি কণ্ঠে স্বাগত জানায় মাতা,
সাত কোটি নিজ সন্তান সাথে উন্নত যার মাথা;
যাহার যশের কীর্ত্তি আজিকে ঘোষিছে জগৎময়,
ভিক্ষুক যে-বা শিক্ষক হয়ে ভুবন করিল জয়—
সে যে সেই রাণী বঙ্গবাণীরই বুক-আলো-করা ধন,
বিশ্বভুবন নন্দিত-করা বন্দিত নন্দন।
সেই বাণী আজি আমারি কণ্ঠে পাঠায় তাহার বাণী,
অক্ষম হোক্ তবু তোমা তরে গাঁথা এ মাল্যখানি;—
পর আজি গলে—দেখুক বিশ্বসাহিত্য-পরিষৎ,
বঙ্গবাণীরই কোলে দোলে আজ ভুবন-ভবিষ্যৎ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী